বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের

জলাবদ্ধতা ও করণীয়

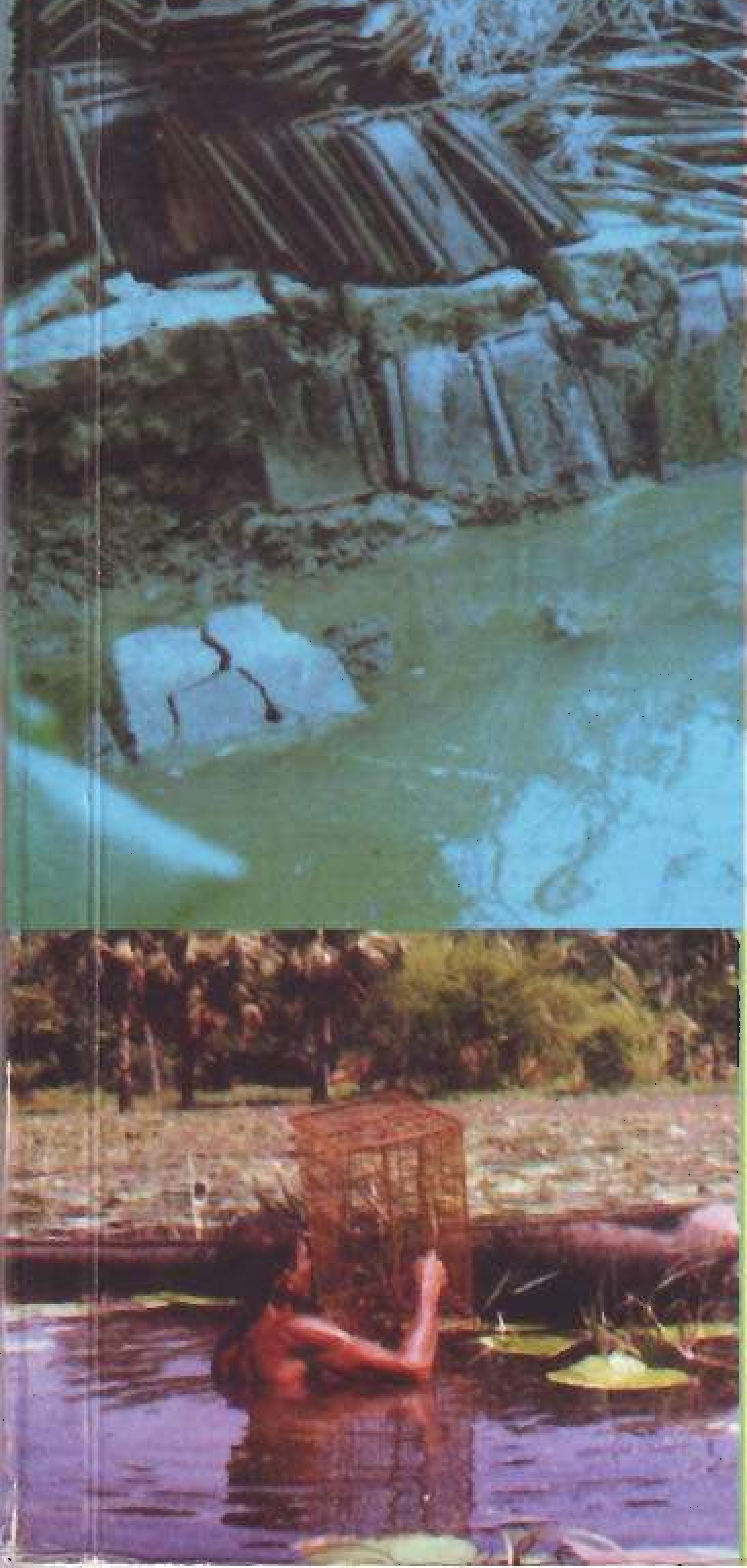

উত্তরণ

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতা ও করণীয়

উত্তরণ

রচনা
শহিদুল ইসলাম
হাসেম আলী ফকির
ফাতিমা হালিমা আহমেদ
শেখ সেলিম আকতার স্বপন

তথ্য সংগ্রহ
মিজানুর রহমান
মোঃ আনিসুর রহিম
আবুল কালাম আজাদ
শহিদুল্লাহ ওসমানী
মনিরুল মামুন

প্রচ্ছদ
শেখর বিশ্বাস

শব্দ বিন্যাস ও অলংকরণ
তাপস কুমার হাওলাদার
গোলাম রব্বানী

মানচিত্র অংকন
মোঃ আলমগীর কবীর

প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা
শেখ সেলিম আকতার স্বপন

মুদ্রণ
প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস
৪৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা

প্রকাশনা
উত্তরণ
তালা সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১-১৮২৩৪৪
ফোন : ০৪১৭৪৬০০৬ এক্স-২৮৪/২৮৩
E-mail : uttaran@bdonline.com

আর্থিক সহায়তা
এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ

প্রকাশ কাল
ডিসেম্বর, ২০০৪

UTTARAN

actionaid bangladesh

মুখবন্ধ

বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলার উপকূলীয় জলাভূমি এলাকার অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো জলাবদ্ধতা। মূলত মাথাভাঙ্গা নদীর শাখা নদী কপোতাক্ষ, ভৈরব, বেত্রাবতী, ভদ্রা, হরি, শ্রী, হামকুড়া ও শৈলমারি প্রভৃতি নদীর অববাহিকায় এই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে মাথাভাঙ্গা নদীর উৎসমুখ ভরাট হয়ে যাওয়া এবং বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে নির্মিত উপকূলীয় বাঁধের কারণে জোয়ার বাহিত পলি নদীবক্ষে অবক্ষেপিত হওয়ার দরুণ এই সব এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

উপকূলীয় বাঁধের পূর্বে জোয়ারবাহিত পলি জোয়ার ভাটার প্লাবনভূমির উপর অবক্ষেপিত হত। যদিও জোয়ার ভাটার এই প্লাবনভূমি এলাকায় লবণাক্ততা,জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়া, ভূমির নিম্নগমন, সুপেয় খাবার পানির দুস্প্রাপ্যতা, চিংড়ি চাষজনিত সমস্যা, কৃষির বিপর্যয় ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে তথাপি সমস্যার তুলনামূলক বিশ্লেষণে জলাবদ্ধ সমস্যাটিই মুখ্য। এ সমস্যা উপকূলীয় জলাভূমির উত্তর অংশ থেকে ধীরে ধীরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে অতিরিক্ত পলির অবক্ষেপন ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সুন্দরবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। উল্লেখ্য এ অঞ্চলের কয়েক লাখ একর জমি ইতিমধ্যে জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং লাখ লাখ মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় বিদ্যমান এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে এ এলাকা অচিরেই মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

এহেন পরিস্থিতিতে এলাকার সাধারণ মানুষ বাঁচার জন্য এবং তাদের জীবন জীবিকার যে ক্ষতি হয়েছে তা পুনরুদ্ধারের জন্য দীর্ঘ দু'দশকেরও অধিক সময় ধরে সংগ্রাম করে আসছে। তাদের এই সংগ্রামের প্রেক্ষিতে সরকার জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের জন্য টিআরএম (নদীতে জোয়ার-ভাটা অব্যাহত রেখে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান) পদ্ধতি নীতিগতভাবে গ্রহন করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ টিআরএম পদ্ধতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মোটেও আন্তরিক ও যৌক্তিক মনোভাব প্রদর্শন করেনি বরং বাস্তবায়নের নামে এ পদ্ধতি অকার্যকর প্রমাণের জন্য বিভিন্ন ধরণের অপকৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে জনগন মনে করে। অন্যদিকে জাতীয় পানি নীতিতে জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তেমন গুরুত্বারোপ করা হয়নি। তাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে সব প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে তা সবই গড়াই-মধুমতি কেন্দ্রিক এবং তা কেবল লবণাক্ততা দূর করার জন্য প্রনীত। এ সব প্রকল্প বা পদক্ষেপ দ্বারা জলাবদ্ধ এলাকার মানুষ বা সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ (বাংলাদেশের) তেমন উপকৃত হবে এমন আশা করা যায় না। যাহোক এ প্রকাশনার মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতা সমস্যাটি যদি নীতি নির্ধারকসহ বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহলে আমাদের এ উদ্যোগ সার্থক হবে।

উত্তরণ ও পানি কমিটি দীর্ঘ দুইদশক যাবৎ জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। মাঠ পর্যায়ে আমাদের দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ সমীক্ষা রিপোর্টটি প্রণীত হয়েছে। এই সমীক্ষা রিপোর্টের খসড়া উত্তরণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে উত্থাপিত সমীক্ষা রিপোর্টের উপর আলোচনা পর্যালোচনার আলোকেই রিপোর্টটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হলো। সেমিনারে উপস্থিত থেকে রিপোর্টটির উপর পর্যালোচনা ও মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাতক্ষীরা জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ ইলিয়াস, আইসিজেডএমপি এর টীম লিডার ড. রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ খোদাবকস্, একশন এইড বাংলাদেশের এসোসিয়েট কোঅর্ডিনেটর তৌহিদ ইবনে ফরিদ লিভলিহুড সিকিউরিটি এন্ড রিক্স রিডাকশন-এর প্রধান শিহাব উদ্দিন আহমেদ, গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপ এর প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর রেবা পাল, তালা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদ, কেয়ার আরভিসিসি প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প সমন্বয়কারী এনজি ডেজি, এ্যাডভোকেসি কোঅর্ডিনেটর গৌতম সরকার, এনজিও ফোরাম এর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোঃ আয়ুব খান, বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমিতির মহাসচিব শেখ আশরাফ-উজ-জামান, সহ-সভাপতি হায়দার গাজী সালাউদ্দিন রুনু ও এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ, উলাসি সৃজনি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আজিজুল হক মনি, কেন্দ্রীয় পানি কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ এবিএম সফিকুল ইসলাম, সদস্য অধ্যক্ষ আশেক-ই-এলাহি, অধ্যক্ষ এনামুল ইসলাম, অধ্যক্ষ রিয়াজুল ইসলাম, দৈনিক সাতক্ষীরা চিত্রের সম্পাদক মোঃ আনিসুর রহিম, দৈনিক পত্রদূতের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ, এটিএন বাংলার প্রতিনিধি এম কামরুজ্জামান, দৈনিক জনকন্ঠের স্টাফ রিপোর্টার মিজানুর রহমান কে।

রিপোর্টটি প্রকাশে সহায়তার জন্য দাতা সংস্থা এ্যাকশন এইড কে এলাকাবসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের যারা দীর্ঘ সময় দিয়ে যত্নসহকারে সমীক্ষা পত্রটি প্রণয়ন করেছেন। বাংলাদেশ জিওগ্রাফিকাল সার্ভে এর উপ পরিচালক রেসাদ মোঃ ইকরাম আলি কচি ও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের পরিচালক ড. আহসান উদ্দিন আহমেদ কে সমীক্ষা পত্রটি সম্পাদনায় সহায়তার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে-

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
উত্তরণ

বিষয় সূচী ঃ **পৃষ্ঠা**

১. ভূমিকা	৫
২. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি	৫
৩. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতার বিবরণ	১১
৪. জলাবদ্ধতায় বিপর্যস্ত জনজীবন, পরিবেশ, উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ	১৪
৫. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতার কারণ	১৭
৬. জলাবদ্ধতা নিরসনে বাস্তবায়নকৃত সরকারী পদক্ষেপ সমূহের পর্যালোচনা	২৬
৭. সরকারের নীতিমালা ও সীমাবদ্ধতা	২৮
৮. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে করণীয়	৩০
৯. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীর প্রবাহ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা সমূহের পর্যালোচনা	৩৪
১০. উপজেলা ভিত্তিক জলাবদ্ধ অঞ্চল, জলাবদ্ধতার কারণ ও নিরসনে করণীয়	৪৭
১১. উপসংহার	৭১

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে বৃহত্তর খুলনা জেলা ও যশোর জেলার নিম্নাংশ এক অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এখানকার বিস্তীর্ণ জলাভূমি দিনে দুইবার জোয়ার দ্বারা প্লাবিত হয়। ঈষৎ লবণ পানির এই এলাকাকে অসংখ্য সামুদ্রিক জলজ প্রাণী তাদের প্রজনন ও শিশু-কৈশোরকালীন আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহার করে। ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন থেকে পাতা ও অন্যান্য জৈব পদার্থ পড়ে সরাসরি খাদ্যকণায় রূপান্তরিত হয়ে জোয়ার-ভাটার টানে জলাভূমি ও সুন্দরবন সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে এখানকার জৈবিক উৎপাদনশীলতা অন্য এলাকার চেয়ে বেশী। এখানকার জোয়ার-ভাটার খাড়ি নদীগুলো সমগ্র এলাকায় জালের মত বিস্তার করে আছে। এ অঞ্চলে ভূমির নিম্নগমনের হার অন্য এলাকার থেকে বেশী (খান ও অন্যান্য ২০০১)। উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের পূর্বে মেঘনা মোহনায় অবক্ষেপিত পলির একাংশ জোয়ারের মাধ্যমে এ জলাভূমিতে উঠে এসে অবক্ষেপিত হয়ে ভূমির নিম্নগমনের হার পূরণ ও ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করত। দেশের মূল ভূ-খণ্ড এমনকি দেশের অন্যান্য উপকূল এলাকা থেকে এখানকার গাছপালা ও পশুপাখির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যকে যথাযথ বিবেচনায় রেখে কখনও এ অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এ প্রকল্পে উন্নয়নের নামে ভঙ্গুর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এ এলাকায় তৈরী করা হয়েছে অসংখ্য বাঁধ, স্লুইসগেট, ক্রস-ড্যাম ইত্যাদি। মানুষের এই অযাচিত ও অপরিকল্পিত হস্তক্ষেপ প্রকৃতিকে করে তুলেছে বৈরী, সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা এবং ক্রমান্বয়ে তা গ্রাস করে ফেলছে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে। তাছাড়া জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, একতরফা ভূমির নিম্নগমনসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এলাকার পরিবেশ ।

জনগণ এই বিরূপ পরিস্থিতি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য পানি কমিটি, বিল ডাকাতিয়া সংগ্রাম কমিটি, কপোতাক্ষ নদ বাঁচাও কমিটি, হামকুড়া নদী খনন বাস্তবায়ন সংগ্রাম পরিষদ প্রভৃতি নামে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে। এই সকল সংগঠনের মাধ্যমে জনগণ দিনের পর দিন সমস্যা সমাধানের দাবী তুলে ধরেছে। কখনও কখনও জনগণের এই দাবীর মুখে সরকার পক্ষ কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তার অধিকাংশকে জনগণ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ভুল বলে মনে করেছে। তবে খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্পে সরকার জনগণের দাবীর মুখে TRM (জোয়ার-ভাটা অব্যাহত রেখে সমস্যা সমাধান) ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও বাস্তবে তার যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার প্রেক্ষিতে জনগণের মধ্যে দেখা দিয়েছে হতাশা। জনগণ আশংকিত এই ভেবে যে উপকূল এলাকায় জলাবদ্ধতা এবং পরিবেশগত সমস্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অদূরভবিষ্যতে এ অঞ্চল মনুষ্য বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে পড়বে।

জনগণ এখনও দৃঢ়ভাবে আস্থা পোষণ করে যে TRM ব্যবস্থাই হতে পারে সমস্যা সমাধানের প্রধানতম কৌশল। কিন্তু বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের অতীত কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণের মধ্যে এক ধরণের আস্থাহীনতাও তৈরী হয়েছে। এমতাবস্থায় সমস্যা সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে দ্রুত বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা না হলে নদী ভরাট ও জলাবদ্ধতার কারণে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য, উৎপাদন ব্যবস্থা ও জনজীবন বিপন্ন হবে। আরও বিপন্ন হবে বিশ্বের ঐতিহ্যমণ্ডিত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন।

২. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি (উত্তরে পদ্মা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে

গড়াই, মধুমতি, বলেশ্বর নদী এবং পশ্চিমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রেখা) ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ এলাকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলোঃ ঈষৎ লবণ পানি, উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা, পলি অবক্ষেপন, ভূমির নিম্নগমন এবং দক্ষিণে পৃথিবীখ্যাত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের অবস্থান। জীববৈচিত্র্যের প্রাচুর্যতায় এ অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ

২.১ ফিজিওগ্রাফি/ভূ-প্রকৃতি ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকার অন্তর্ভূক্ত। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব-দ্বীপ। পূর্বে গঙ্গা বা পদ্মা নদীর দক্ষিণ ভাগ ছিল সমুদ্র অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের অংশ। সমুদ্র উপকূলের নীচের দিকে চর পড়ে কালক্রমে এই ভূখন্ডের সৃষ্টি হয়েছে। নবগঠিত এসব ভূ-ভাগে সুন্দরবন সৃষ্টি হয়। ভূমি গঠনের সাথে সাথে সুন্দরবনও ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

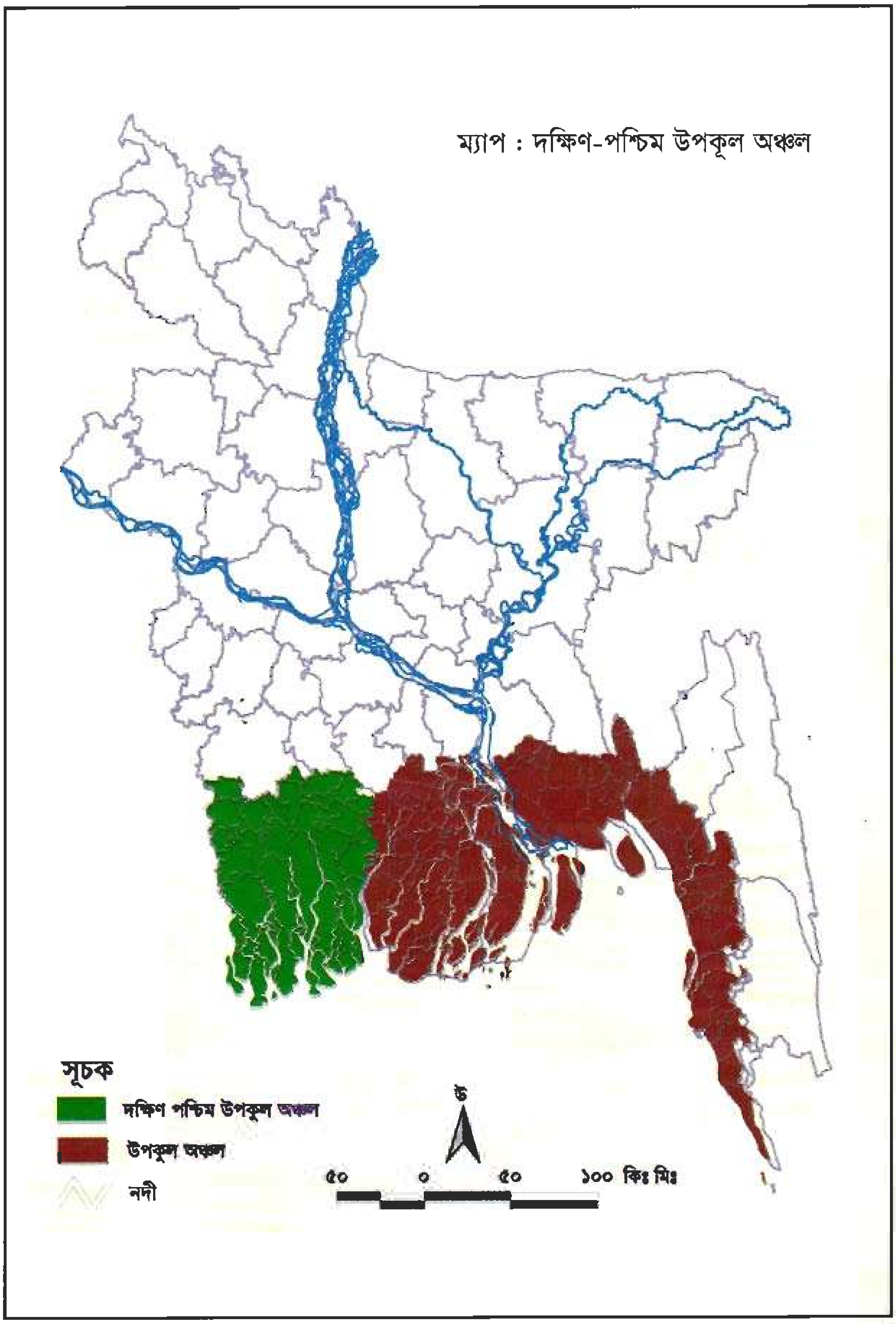

সুন্দরবনের উত্তরাংশ থেকে বন কেটে এখানে মানব বসতি গড়ে উঠে (প্রধানত নদীর পাড়ে)। দুই নদীর দুই পাড়ের বসতির মাঝখানে বিস্তীর্ণ এলাকা বিল বা জলাভূমি। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এলাকার ভূ-গঠন প্রক্রিয়া একদিকে যেমন নদীর গতিমুখ পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত অন্যদিকে তেমন জোয়ার-ভাটা প্রবাহের সাথেও সম্পর্কিত। গঙ্গা নদী

বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ভূমিগঠন করে অগ্রসর হয়েছে। ফলে ভূগঠনের ঢালও সেভাবে বিন্যাস্ত। অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ভূমি ক্রমশঃ নীচু। নদীর খাত পরিবর্তন হওয়ায় পূর্ববর্তী খাতের অববাহিকা মৃত ব-দ্বীপে পরিনত হয়েছে। মৃত ব-দ্বীপের নিম্নাংশ কেবলমাত্র জোয়ার-ভাটা দ্বারা সক্রিয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের গঙ্গার পূর্ববর্তী খাত মাথাভাঙ্গা নদী গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে মধ্যবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা মৃত ব-দ্বীপে পরিণত হয়েছে। গড়াই অববাহিকায়ও এখন গঙ্গার প্রবাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুরূপ মৃত ব-দ্বীপে পরিণত হতে যাচ্ছে।

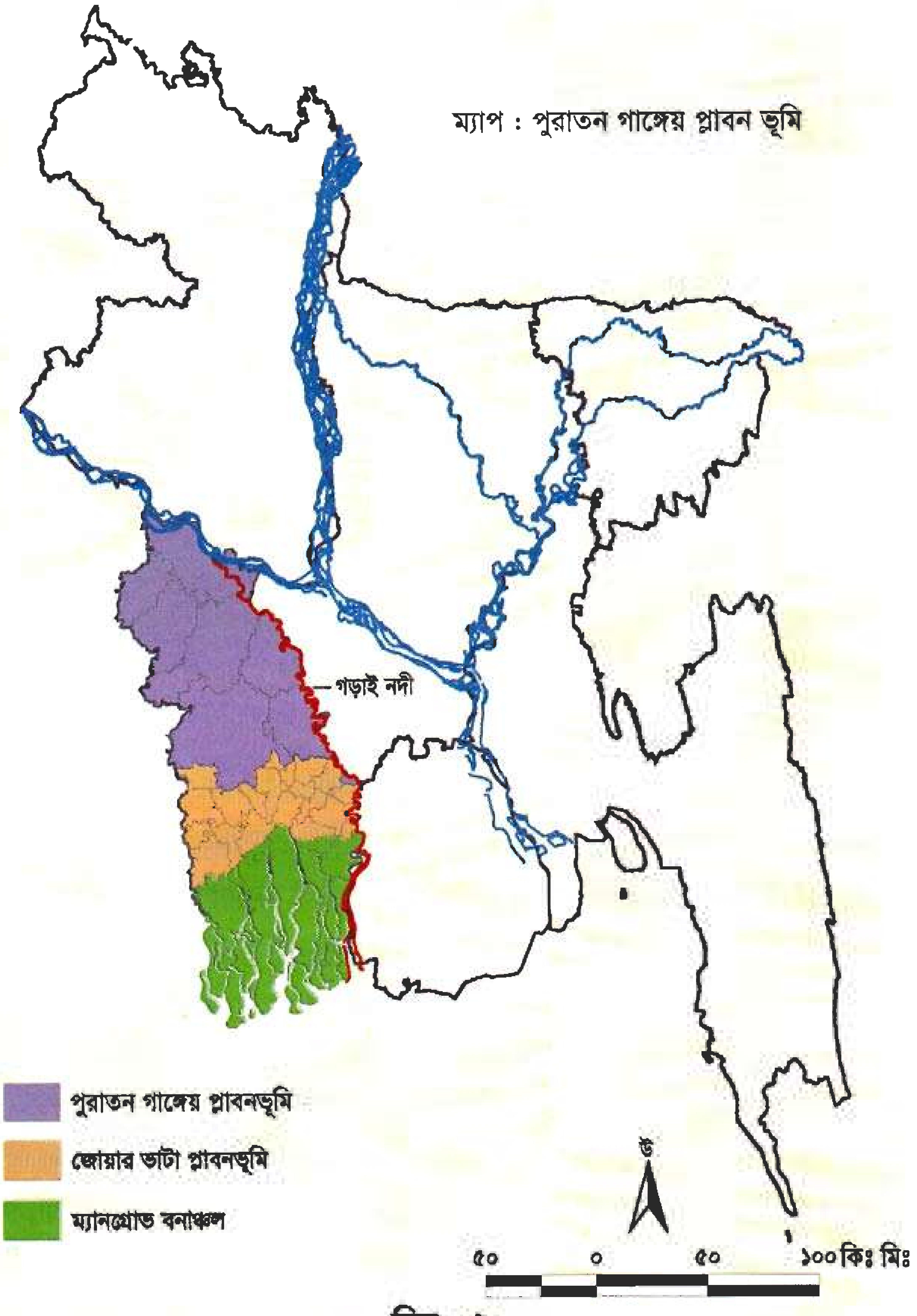

চিত্র : ২

বাংলাদেশের এ অঞ্চল মূলতঃ গঙ্গা এবং তার শাখা নদীর পলি অবক্ষেপনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। ভূমিগঠন অনুসারে এই অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তরের পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি, মধ্যের জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমি ও দক্ষিণের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (আলম ও অন্যান্য ১৯৯০)।

পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি ঃ পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এলাকাটি গঙ্গা/পদ্মার প্রবাহ থেকে বর্তমানে বিচ্ছিন্ন। ভূমি মোটামুটি সমতল হলেও নদী বরাবর কিছুটা উঁচু। সময়ের সাথে সাথে নদীগুলি তার প্রবাহ ও দিক পরিবর্তনের ফলে এখানে অসংখ্য বাওড় ও নিম্নভূমির (বিল) সৃষ্টি হয়েছে। সাগরপৃষ্ঠ থেকে এ প্লাবনভূমি ১০ হতে ৬০ ফুট উচ্চতার মধ্যে অবস্থিত।

এখানে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিগঠন প্রক্রিয়া চলছে না, তবে ভূমি ক্ষয় হয়ে নিকটস্থ বাওড় ও নিম্নভূমি দিন দিন ভরাট হচ্ছে। এলাকাটি বন্যামুক্ত। গঙ্গার শাখা নদীগুলো বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ১৯৩৮ সালের পর এ এলাকায় কোন ঢলপানির বন্যা দেখা যায়নি। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবলমাত্র ২০০০ ও ২০০৪ সাল। ২০০০ সালে গঙ্গার দক্ষিণ পাড় প্লাবিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকাসহ বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, যশোর ও সাতক্ষীরা অঞ্চল প্লাবিত হয়। বর্তমানে অধিক বৃষ্টিপাত ও মনুষ্য কর্মকাণ্ডের ফলে এলাকাটি বন্যার ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় পরিণত হয়েছে এবং জলাবদ্ধতার ভয়াবহতা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমির একেবারে নিম্নাংশ বর্তমান জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমির অংশ হিসেবে বিবেচিত।

জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমি ঃ পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি ও ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের মধ্যবর্তী অংশ জোয়ার ভাটা প্লাবনভূমি। এলাকাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এলাকা প্রতিদিন দু'বার জোয়ার ভাটায় প্লাবিত হয়। জোয়ার-ভাটার পানির উচ্চতা এবং স্রোতের গতিবেগ নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের পরিমান ও তিথি-নক্ষত্রের অবস্থানের উপর। ভরাকটালে পানির উচ্চতা ক্রমান্বয়ে স্ফীত হতে থাকে, মরাকটালে তা আবার কমতে থাকে। এভাবে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা পানির উচ্চতাকে প্রভাবিত করে। ঋতুভেদেও জোয়ার-ভাটার উচ্চতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে জোয়ারের পানির উচ্চতা স্থান ভেদে ৩ হতে ৮ ফুট বেড়ে থাকে। ভূমি অপেক্ষাকৃত সমতল, নদী ও তার শাখা প্রশাখা এখানে জালের মত বিস্তারলাভ করে আছে।

এলাকাটি সাগরপৃষ্ঠ হতে ৩ থেকে ১০ ফুট উচ্চতার মধ্যে অবস্থিত। সাগরের ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় এবং নদীর ভাঙা গড়ায় এলাকাটি খুবই সক্রিয়। এখানে ভূমির নিম্নগমন, জোয়ারবাহিত পলির অবক্ষেপন, নদীর গতিপথ পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়া, যা এলাকার সক্রিয়তা প্রমাণ করে।

ভূ-তত্ত্ববিদগণ মনে করেন, এখানে ভূমি নিম্নগমনের হার অপেক্ষাকৃত বেশী (খান ও অন্যান্য ২০০১)। নতুন করে পলি জমে ভূমির এই নিম্নগমন পূরণ হয় ও ভূমি উঁচু হয়। পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমির নিম্নাংশে এবং জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমিতে কম বেশী পীট বা জোবমাটির আধিক্য দেখা যায়। পীট মাটির গঠন বা বুনন অত্যন্ত শিথিল। সে কারণে এখানকার ভূমির নিম্নগমন বা বসে যাওয়ার হার (Land Subsidence and height loss) বাংলাদেশসহ বিশ্বের যে কোন স্থানের তুলনায় বেশী, এই হার বৎসরে ১/২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে (ড. মনিরুল হকের গবেষণা)। তবে বর্তমানে নদীর দুই তীর বরাবর বাঁধ নির্মানের ফলে ভূমিতে পলি অবক্ষেপণ প্রক্রিয়া অনেক স্থানে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে নদীতেই পলি অবক্ষেপন হয়ে নদী ক্রমাগত ভরাট হচ্ছে।

জোয়ার-ভাটা এলাকার নদীর পানি ঈষৎ লবণাক্ত। উজান এবং সমুদ্র পানির মিশ্রণে এ ধরনের পানির সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র থেকে ভূখন্ডের দিকে যত উপরে উঠা যায় ততই পানির লবণাক্ততা কম। আবার পশ্চিম থেকে যত পূর্ব দিকে যাওয়া যায় ততই লবণাক্ততার তীব্রতা কম। লবণাক্ততার এই তারতম্যের কারণে বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে ভিন্ন ধরনের গাছপালা, উদ্ভিদ, মৎস্য,জীবজন্তু এবং ভিন্ন ধরনের ফসল।

জোয়ারের মাধ্যমে সমুদ্র বা মোহনা থেকে উঠে আসা পলি বিলে বা জলাভূমিতে পতিত হয়ে একদিকে যেমন ভূমি উঁচু ও উর্বর করে অন্যদিকে নদীর নাব্যতাও বজায় রাখে। প্লাবনভূমিতে জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ এবং উভচর প্রাণীর জন্য সৃষ্টি হয় খাদ্য সংগ্রহ, বিচরণ, প্রজনন এবং বসবাস উপযোগী অনুকূল পরিবেশ জোয়ারের পানির সাথে মোহনা দিয়ে প্লাবনভূমিতে উঠে আসে মাছ ও অনেক সামুদ্রিক প্রাণী। নদীর স্রোতে তাদের প্রজনন ঘটে। এখানে নদনদী ও প্লাবনভূমিতে তাদের শৈশব ও কৈশোর লালিত পালিত হয়। আবার প্লাবনভূমির অনেক জলজ প্রাণী প্রজননের জন্য ভাটিতে সুন্দরবন বা সমুদ্র মোহনায়ও চলে যায়।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব দক্ষিণে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের অবস্থান। এটা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ একক ম্যানগ্রোভ বন যা সুন্দরবন নামে পরিচিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এলাকাটি বিভিন্ন প্রজাতির চিরসবুজ ম্যানগ্রোভ গাছে পরিপূর্ণ। অসংখ্য নদী এখানে জালের মত বিস্তারলাভ করে আছে। সাগরের কাছে নদীগুলি বেশ চওড়া হয়ে মোহনার সৃষ্টি করেছে। সুন্দরবনও জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমির মত দিনে দুই বার প্লাবিত হয়। এখানকার মাটি ও পানির লবণাক্ততা খুব বেশী। ভূমি সমতল এবং সাগরপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৩ ফুটের মধ্যে। এখানে জোয়ারে পানির উচ্চতা ৮ থেকে ১২ ফুট বাড়ে। এলাকাটি জোয়ার ভাটা প্লাবনভূমির মত খুবই সক্রিয়। এখানে ভূমি নিম্নগমনের হার বেশী তবে তা পলি অবক্ষেপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঈষৎ লবণপানিকে কেন্দ্র করে এখানকার বন্য ও জলজ জীবনের সমন্বয়ে বিশেষ ইকোসিস্টেম গড়ে উঠেছে।

২.২ ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস ঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল মূলত গঙ্গা এবং এদের শাখা নদীর পলি অবক্ষেপনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিকগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে এই অঞ্চলের তথা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ গঠনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। এক দল (ওল্ডহ্যাম, ১৮৭০, বাগচি, ১৯৪৪ এবং হক ১৯৮২) মনে করেন ভাগিরথীই হলো গঙ্গার মূল ধারা। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সৃষ্টিতে এ ধারাটাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। কালক্রমে গঙ্গা, ভাগিরথীর মূল ধারা হতে পূর্বদিকে সরে গিয়ে মাথাভাঙ্গা, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি নদীর মাধ্যমে পলি অবক্ষেপন করে এ ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে।

অন্য দল (চৌধুরী ১৯৯৬ এবং হোসেন ১৯৮৬) মনে করেন প্রথম থেকেই গঙ্গার দুটি ধারা ছিল। একটি ভাগিরথী-হুগলী, অন্যটি গঙ্গা-পদ্মা। গঙ্গার প্রধান ধারা ছিল বর্তমানের গঙ্গা-পদ্মা নদী, ভাগিরথী-হুগলী নয়। ভাগিরথী নদী ভারতের পশ্চিম বঙ্গের ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে সোজা দক্ষিণ বরাবর প্রবাহিত হয়ে মোহনার কাছে হুগলী নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। গঙ্গা পূর্ব দিক বরাবর প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের ভেতর পদ্মা নাম ধারণ করেছে। পদ্মা বাংলাদেশের চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে মিলিত হয়ে দক্ষিণে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হয়েছে। ভাগিরথী এবং পদ্মা নদীর শাখা প্রশাখার অবক্ষেপনের মাধ্যমে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে।

ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূমি কোয়াটারনারি (অনুর্দ্ধ বিশ লক্ষ বছর) পলল দ্বারা আবৃত। এখানে আদিশিলার উপর পললের পুরুত্ব ৩ থেকে ৯ হাজার মিটারের বেশী এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ বরাবর এই পুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়াও ১৮ হাজার বছর আগে অর্থাৎ বরফ যুগে পৃথিবীব্যাপী সাগরের পানির

উচ্চতা বর্তমানের তুলনায় ১২০ ফুট নীচে নেমে গিয়েছিল। এর ফলে গঙ্গা এবং তার শাখা সমূহের গভীরতাও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী এবং নদীগুলো ছিল অত্যধিক খরস্রোতা। ধারণা করা হয়, ঐ সময় আমাদের উপকূল রেখা সোয়াচ অব নো-গ্রাউণ্ডের কাছে ছিল। পরবর্তীতে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ৭ থেকে ৮ হাজার বছর আগে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে ভারতের পশ্চিম বাংলায় রাজমহল পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছে (ভারমা ও মাথুর ১৯৭৮, ব্যানার্জি এবং সেন ১৯৮৮, উমিতসু ১৯৮৭ এবং ১৯৯৩)। এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ বেশ কয়েকবার উঠা নামার মাধ্যমে পলি অবক্ষেপিত হয়ে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ গঠন করে।

মাত্র ৩ থেকে ৪ হাজার বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠ ও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ বর্তমান কাঠামোতে ফিরে আসে বলে ধারণা করা হয়। সুন্দরবনের ইতিহাসও আনুমানিক ৪ হাজার বছরের। প্রাচীন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ৮ থেকে ১০ হাজার বছর পূর্বে পলি জমে সৃষ্টি হয়েছিল। গঙ্গার প্রধান ধারা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পূর্ব দিকে পদ্মা বরাবর প্রবাহিত হওয়াতে এ এলাকার নদী খরস্রোতা না থাকায় এবং ভূমির নিম্নগমনের হার বেশী হওয়ায় এ অঞ্চলে খুব পুরু স্তরের সূক্ষ্মদানার পলল অবক্ষেপিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্রে (আলম ও অন্যান্য,১৯৯০) দেখা যায়, এ অঞ্চল প্রধানত ৪ ধরনের অবক্ষেপন দ্বারা আবৃত। যথা ম্যানগ্রোভ স্যোয়াম্প্ অবক্ষেপ, ব-দ্বীপীয় জোয়ার-ভাটা অবক্ষেপ, ব-দ্বীপীয় পলি অবক্ষেপ এবং নিম্নভূমির কাদা ও পীট অবক্ষেপ। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. ম্যানগ্রোভ স্যোয়াম্প্ অবক্ষেপ ঃ জৈব পদার্থ মিশ্রিত পলল দ্বারা ম্যানগ্রোভ স্যোয়াম্প অবক্ষেপ গঠিত। পলি কাদা অবক্ষেপন গাঢ় ধূসর হতে কালো বর্ণের । এই অবক্ষেপের ভেতর গাছের গুড়ি এবং গাছের অংশবিশেষ বিদ্যমান। । সুন্দরবন অঞ্চলে এ ধরনের অবক্ষেপ দেখা যায়।

খ. ব-দ্বীপীয় জোয়ার-ভাটা অবক্ষেপ ঃ অবক্ষেপন প্রধানত কাদা, পলি মিশ্রিত কাদা এবং পলি। তবে নদী বরাবর চিকন দানার বালু পাওয়া যায়। অবক্ষেপ হাল্কা ধূসর থেকে সবুজাভ ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। কিছু কিছু এলাকায় অবক্ষেপন জারিত হয়ে হলুদাভ বর্ণ ধারণ করেছে। মাটির গভীরে পীট ও কাদা মিশ্রিত পীট পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও মাটির নীচে গাছের গুড়ি বা গাছের অংশবিশেষ দেখা যায়। সুন্দরবনের উপরে জোয়ার ভাটা অঞ্চলে এ ধরনের অবক্ষেপ দেখা যায়।

গ. ব-দ্বীপীয় পলি অবক্ষেপ ঃ অবক্ষেপন প্রধানত পলি, কাদা মিশ্রিত পলি এবং বালু। পলি এবং কাদা মিশ্রিত পলি হলুদাভ বর্ণের। সাধারণত পলি ও কাদা মিশ্রিত পলির স্তরের ভিতর বালুর স্তর দেখা যায়। নদী বরাবর বালুর স্তরের প্রাধান্য দেখা যায় এবং মাটির গভীরে মোটা দানার বালু পাওয়া যায়। পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমিতে এ ধরনের অবক্ষেপ দেখা যায়।

ঘ. নিম্নভূমির কাদা এবং পীট অবক্ষেপ ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সব এলাকায় নিম্নভূমিতে বিক্ষিপ্তভাবে কাদা ও পীট বিদ্যমান। নিম্নভূমিতে প্রধানত কাদা, পীট ও পীটমিশ্রিত কাদা দেখতে পাওয়া যায়। কাদা ধূসর হতে নীলচে ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। পীট সাধারণত কালো বর্ণের। নিম্নভূমিতে গাছপালা জন্মে পরবর্তীতে পীটে রূপান্তরিত হয়েছে। কাদার ভেতর পীট এবং কাদামিশ্রিত পীটের স্তর দেখা যায়। কোথাও কোথাও পীটের ৩ থেকে ৪টা স্তরও দেখা যায়। নিম্নভূমির কেন্দ্রে পীট স্তরের পুরত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী। পীট, কাদা মিশ্রিত পীট এবং কাদার স্তরের ভেতর গাছের অংশবিশেষও দেখা যায়। প্রধানত পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি ও জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমিতে পকেট আকারে এ অবক্ষেপ দেখা যায়।

৩. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতার বিবরণ

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সবুজ বিপ্লবের নামে উপকূলীয় জলাভূমিকে শুষ্কভূমিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে শুরু করে। যার ধারাবাহিকতায় দেশের প্রায় সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার পরিবেশ ও অধিক ভঙ্গুর প্রতিবেশকে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি। ফলে প্রকল্প শেষ হবার পর কয়েক বছর পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হলেও মাত্র এক দশক পর থেকে জলাবদ্ধতা, নদী ভরাট সমস্যা সহ এ এলাকায় নানারূপ পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিতে শুরু করে।

বর্তমানে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের প্রধান ও ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত সমস্যা হল জলাবদ্ধতা। সমগ্র খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলা, যশোর জেলার নিম্নাংশ এবং বাগেরহাট জেলার একাংশ বর্তমানে জলাবদ্ধতা কবলিত। এ অঞ্চলের ২০ টিরও বেশী উপজেলার প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর এলাকা ইতিমধ্যে জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত হয়েছে। জলাবদ্ধতার হাত থেকে সুন্দরবনও রক্ষা পাচ্ছে না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় খুব শীঘ্রই সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের বাদবাকী এলাকাও জলাবদ্ধ হয়ে পড়বে।

গত শতাব্দীর ৭০ এর দশকের শেষ দিকে পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি ও জোয়ার ভাটার প্লাবনভূমির সংযোগস্থল অর্থাৎ যশোরের নিম্নাংশ থেকে জলাবদ্ধতা শুরু হয়, ৮০'র দশকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং ৯০'র দশকে তা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় মহামারী রূপ ধারণ করে। জোয়ারভাটার প্রান্তসীমায় জলাবদ্ধতা শুরু হয়ে ক্রমশঃ দক্ষিণে সম্প্রসারিত হচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে (১৯৯৬) ৪৭,৫৫০ হেক্টর এলাকা জলাবদ্ধ এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন না করলে ভবিষ্যতে আরো ৬৫,৭০০ হেক্টর এলাকা জলাবদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে(আলি এবং আহমেদ-২০০১)। স্থানীয় এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি বছর ১০-১২ হাজার হেক্টর এলাকা নুতন করে জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত হচ্ছে এবং এই হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে (উত্তরণ সমীক্ষা, ২০০৫)।

ভূমির ঢাল অনুসারে জলাবদ্ধতা ক্রমশ নদীর অববাহিকা বরাবর অগ্রসর হচ্ছে। স্থানীয় এক সমীক্ষায় দেখা গেছে জোয়ারের প্রান্তসীমায় নদীবক্ষে প্রতিবছর ৩/৪ ফুট পলি জমে। পলি জমার হারও প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পলি ভরাটের দরুণ প্রতি বছর প্রান্তসীমার ৫-৭ কি.মি. নদীর মৃত্যু হচ্ছে (উত্তরণ, নিজস্ব সমীক্ষা-২০০৪)। নিম্ন অববাহিকার দিকে নদী ভরাট হয়ে ক্রমান্বয়ে নদী অগভীর ও সংকুচিত হয়ে ক্ষুদ্র নালার আকৃতি ধারণ করছে।

গত শতাব্দীর ৮০'র দশকের শুরুতে হামকুড়া, শৈলমারি, হরি ও আপারভদ্রা নদী পলিতে ভরাট হবার প্রেক্ষিতে বিল ডাকাতিয়াসহ ডুমুরিয়া, ফুলতলা, অভয়নগর, কেশবপুর, মণিরামপুর ও তালা থানার বিস্তীর্ণ এলাকা জলাবদ্ধতার শিকার হয়। পরবর্তীতে কপোতাক্ষ-বেতনা ও অন্যান্য নদী অববাহিকায় ক্রমান্বয়ে জলাবদ্ধতা সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে।

কপোতাক্ষ এ অঞ্চলের প্রধান নদী। উজানে বর্তমানে পদ্মা নদীর সাথে কোন সংযোগ না থাকলেও এখনও বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়ার পশ্চিমাংশের বৃষ্টিরপানিসহ ভারতের একাংশের বৃষ্টিরপানি এই কপোতাক্ষ নদী দিয়েই নিষ্কাশিত হয়। সম্প্রতি তালা উপজেলার মাগুরা থেকে ঝিকরগাছা উপজেলার বাকড়া পর্যন্ত কপোতাক্ষ নদটি সম্পূর্ণভাবে জোয়ার বাহিত পলি অবক্ষেপণের মাধ্যমে ভরাট হয়ে গেছে। কপোতাক্ষ নদীর এই অংশ ভরাট হওয়ার কারণে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর অঞ্চল থেকে আগত বৃষ্টির পানি এই নদী দিয়ে নিষ্কাশিত হতে না পেরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। ফলে বিগত কয়েক বছর থেকে কপোতাক্ষের দু'কূল, বিশেষ করে, কেশবপুর, মণিরামপুর, ঝিকরগাছা, কলারোয়া, তালা এবং সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কিছু এলাকা নিয়মিত জলাবদ্ধতার শিকার হচ্ছে। গত ২০০৪ সালের কপোতাক্ষ অববাহিকায় জলাবদ্ধতাজনিত বন্যা মারাত্মক রূপ নেয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ ২০০০ সালের বন্যার মত ভয়ংকর অবস্থার মুখোমুখি হয়। পর পর ঘটে যাওয়া এ সকল ঘটনা সমগ্র এলাকাবাসীকে প্রচণ্ডভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

কপোতাক্ষ নদের উৎপত্তি ভৈরব নদী থেকে যা যশোরের দক্ষিণ পাশ দিয়ে সাতক্ষীরায় প্রবেশ করে আড়পাঙাসিয়া নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। অন্যদিকে ভৈরব নদীটি তাহেরপুর থেকে আপার ভৈরব নাম নিয়ে খুলনা শহরের কাছে লোয়ার ভৈরব নাম ধারণ করে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বলেশ্বর নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভৈরব নদীটি তাহেরপুর থেকে যশোর শহর পর্যন্ত পলিদ্বারা ভরাট হয়ে গেলে কপোতাক্ষ হয়ে ওঠে ভৈরব নদীর প্রবাহের প্রধান খাত। এক সময় ভৈরব- কপোতাক্ষ দিয়ে পদ্মার বিপুল জলরাশি বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো। বর্তমানে ভৈরব বা কপোতাক্ষের সঙ্গে পদ্মার প্রবাহের কোন সম্পর্ক নেই। কপোতাক্ষ শুধুমাত্র কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, খুলনা এবং সাতক্ষীরার একটি অংশের বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের প্রধান চ্যানেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই এই নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। নদটির বর্তমান অবস্থা বিচার করলে একে ৩ ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

সাগরদাড়ি গ্রামের পাশে কচুরিপানা পূর্ণ শীর্ণকায় কপোতাক্ষ নদ

প্রথমতঃ মনিরামপুরের ঝাঁপা থেকে বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়ার অংশে কপোতাক্ষ একটি মৃতনদ হলেও নদের খাত বর্তমানে যা আছে তা অনেকাংশে নিষ্কাশন চ্যানেলের উপযোগী। যদিও তা স্থানবিশেষে শ্যাওলা ও অন্যান্য আগাছা দ্বারা পূর্ণ।

দ্বিতীয়তঃ মণিরামপুরের ঝাঁপা থেকে তালা উপজেলার মাগুরা পর্যন্ত জোয়ার বাহিত পলি অবক্ষেপিত হয়ে ইতিমধ্যে ভরাট হয়ে গেছে এবং এই অংশের কোথাও কোথাও নিষ্কাশন চ্যানেলের অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতার। যদিও গত ২ বছর ধরে সরকার ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা রক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু নদীতে জোয়ারের পানিতে আসা পলি অবক্ষেপনের হার বেশী হবার কারণে বারংবার ড্রেজিং করলেও তা কার্যকরী হচ্ছে না।

তৃতীয়তঃ নদের নিম্ন অংশে বর্তমানে জোয়ারভাটা চালু থাকলেও দ্রুত জোয়ার বাহিত পলি নদীবক্ষে অবক্ষেপিত হয়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর ২ থেকে ৪ ফুট পর্যন্ত পলি অবক্ষেপণ কপোতাক্ষ ভরাট হওয়ার প্রধান কারণ এবং এর ফলে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ব্যাপক পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

ভৈরব সম্ভবত এ এলাকার সবচেয়ে পুরাতন নদী। গঙ্গা নদী থেকে উৎপত্তি হয়ে মেহেরপুর-যশোর-খুলনার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরব খুলনার দক্ষিণ-পূর্বে বলেশ্বর নদীতে মিলিত হয়েছে। যশোর জেলার তাহেরপুরের নিকট ভৈরবের অন্যতম শাখা নদী কপোতাক্ষ সোজা দক্ষিণ বরাবর সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিলিত হয়েছে। বর্তমানে ভৈরব তার উৎসমুখ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নদীর উত্তরাংশ মৃত নদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। নদীর নিম্নাংশে জোয়ার ভাটা পরিলক্ষিত হলেও এ অংশও অতি দ্রুত পলি জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

একসময় ভৈরব নদী যশোর, খুলনা এবং কুষ্টিয়ার পশ্চিমাংশের মিষ্টিপানি সরবরাহের একমাত্র উৎস ছিল। ভারতের মুর্শিদাবাদের ওপর দিয়ে প্রবাহিত জলাঙ্গি এবং কুষ্টিয়া জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত মাথাভাঙ্গা নদীও একসময় ভৈরব নদীকে পুষ্ট করত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাথাভাঙ্গার উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং একই সঙ্গে জলাঙ্গীর যে শাখা মাথাভাঙ্গার শাখার সংগে মিলিত হয়ে ভৈরব নদী পুষ্ট করেছিল, তাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভৈরব নদী সম্পূর্ণরূপে মিষ্টিপানির প্রবাহ হতে বঞ্চিত হয় এবং এই নদীর মিষ্টিপানির উপর নির্ভরশীল এলাকা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৮৭২ সালে যশোর ও খুলনায় ম্যালেরিয়া মহামারি আকারে বিস্তার লাভ করে এবং এ বিষয়ে ডাঃ জ্যাকসন ভৈরবের অপমৃত্যুকে দায়ী করেন।

বেত্রাবতী বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। নদীটির কিছু অংশ ইতিমধ্যে পলি দ্বারা ভরাট হয়ে গেছে এবং এর ফলে বেত্রাবতী অববাহিকা বিশেষ করে কলারোয়া ও সাতক্ষীরা উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা ইতিমধ্যে জলাবদ্ধতার শিকার হয়েছে।

পলি ভরাটে মৃত প্রায় হরি নদী

বাগেরহাট ও খুলনা জেলার তেরখাদা, মোল্লাহাট, ফকিরহাট ও রূপসা উপজেলার প্রায় ২০,০০০ হেক্টর জমি দীর্ঘদিন যাবৎ জলাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। জোয়ার বাহিত পলির অবক্ষেপনের ফলে চিত্রা ও আঠারবাকী নদী নাব্যতা হারিয়ে ফেলায় এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। এই এলাকার জলাবদ্ধতা দূর করতে আজ পর্যন্ত সরকারীভাবে তেমন কোন বড় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ প্রতি বছর জলাবদ্ধ এলাকার পরিমান এবং সেই সাথে জনগণের দুর্ভোগ বেড়ে চলেছে ।

জলাবদ্ধতা সমস্যার এখানেই শেষ নয়। বর্তমানে বৃহত্তর খুলনা জেলা ও যশোর জেলার নিম্নাংশের সকল নদীতে জোয়ার বাহিত পলির মাত্রাতিরিক্ত অবক্ষেপন হচ্ছে । ফলে যে সকল নদী এখনো পলি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয়ে যায়নি অদূর ভবিষ্যতে সেসব নদী ভরাট হয়ে যাবে, পরিণতিতে তখন আরো নতুন নতুন এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে।

৪. জলাবদ্ধতায় বিপর্যস্ত জনজীবন, পরিবেশ, উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ

ক্রমবর্ধমান জলাবদ্ধতা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জনজীবন, পরিবেশ, উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ইতিমধ্যে জলাবদ্ধতার কারণে এ অঞ্চলের জনজীবনে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে এসেছে। রাস্তাঘাট, বাড়ির উঠোন, কবরস্থান, শ্মশান, ফসলের মাঠ সবই পানিতে নিমজ্জিত। কোথাও কোথাও ঘরবাড়ি প্লাবিত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। ফলে জলাবদ্ধ এলাকায় বসবাস, যাতায়াত, প্রসাব-পায়খানা-গোসল করা, হাতমুখ ধোয়া ইত্যাদি নিত্যকর্ম সম্পাদন করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, সাপ-ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীর সঙ্গে মানুষ একত্রে বসবাস করতে বাধ্য হয়। আবাসস্থল হারিয়ে অনেকে আশ্রয় নেয় গ্রামের পার্শ্ববর্তী উঁচু রাস্তা বা উঁচু স্কুল কলেজে। মানবেতর জীবন যাপনে অসহায় মানুষের আর্তনাদ ও হাহাকারে ভারী হয়ে উঠেছে জলাবদ্ধ জনপদ।

জলাবদ্ধ এলাকার পানিতে মানুষের মলমূত্র, বিভিন্ন মরা জীব-জন্তুর দেহাবশেষ, বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ ও ঘাস-কুটো পঁচে একাকার হয়ে যায়, বিষিয়ে তোলে এলাকার পরিবেশ। দীর্ঘদিন পানিতে নিমজ্জিত থাকায় বিভিন্ন গাছপালা মরে যাওয়ায় বিবর্ণ-বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এলাকার প্রকৃতি।

ফসলের ক্ষেত, সবজির মাঠ সবই গ্রাস করে জলাবদ্ধতা। নিঃশেষ হয়ে যায় কৃষক, ভেঙ্গে পড়ে উৎপাদন ব্যবস্থা। জীবিকা নির্বাহের জন্য চাল-ডাল, শাক-সবজিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা সকলের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এলাকায় কোন ফসল চাষের সুযোগ থাকে না, তাই কর্মহীন বেকারে পরিণত হয় অধিকাংশ জলাবদ্ধ গ্রামের মানুষ। কাজ না থাকায় দিনমজুরের চাহিদা ও মজুরি কমে যায়। মানুষ কাজের সন্ধানে বা অর্থ উপার্জনের আশায় ধাবিত হয় শহরের পথে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বস্তিতে থেকে খুলনা, সাতক্ষীরা বা যশোর শহরে রিক্সা চালায় অধিকাংশ কৃষি শ্রমিক। অনেকে আবার অতিপ্রত্যুষে গ্রাম থেকে ৫/৭ কিলোমিটার পথ পায়ে হেটে তারপর বাসে ঝুলে যায় এসব শহরে রিক্সা চালাতে।

কেসস্টাডি- ১
ক্ষেতমজুর রহমান এখন শহরের রিক্সা চালক

ডুমুরিয়া উপজেলার ঘোষড়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুর রহমান। স্ত্রী ও এক কন্যা নিয়ে তিন জনের সংসার তার। গ্রামে দিন মজুরী করে তার সংসার চলত। এলাকা জলাবদ্ধ হওয়ার কারণে তার আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফসলের মাঠ রাস্তা-ঘাট সব পানির নীচে, তাই গ্রামে কাজ নেই। চারিদিকে পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত পানি, গোসল করা যায় না। রান্না খাওয়া বা নিত্যকর্ম সম্পাদনের মত একতিল মাটিও আর জেগে নেই। ক্রমবর্ধমান জলাবদ্ধতায় তার মাটির ঘর দু'টিও একসময় ভেঙ্গে পড়ে। নিরুপায় হয়ে স্ত্রী কন্যা নিয়ে গ্রামের পশের উঁচু রাস্তার উপর একচালা বেঁধে বসবাস করতে থাকে সে। অভাবের তাড়নায় অর্থ উপার্জনের আশায় এক সময় সে শহরের পথে পা বাড়ায়। প্রতিদিন সে ঘোষড়া গ্রাম থেকে ৪/৫ কিলোমিটার পথ পায়ে হেটে ১৮ মাইল বাজারে যায়, তারপর বাসে চড়ে ৩০ কিলোমিটার দূরের শহর খুলনায় যেয়ে রিক্সা চালায় সে। আবার রাতে ফিরে আসে। শুষ্ক মৌসুমে পানি কমে যাওয়ায় রাস্তা ছেড়ে বাড়িতে ফিরে এসেছে তারা। ধ্বসে পড়া তাদের মাটির ঘর দু'টি রহমান ও তার স্ত্রী মিলে মেরামত করছে। জলাবদ্ধতার কারণেই গ্রামীন দিনমজুর আব্দুর রহমান এখন শহরের রিক্সা চালক।

সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে উপার্জিত টাকায় পরিবার পরিজনের জন্য চাল-ডাল-তেল কিনে ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্ন পায়ে আবার তারা বাড়ি ফেরে গভীর রাতে। বিভিন্ন ইট ভাটায় বাঁধা শ্রমিকে পরিণত হয়েছে অনেকে। অনেকে চলে গেছে ঢাকা বা অন্য কোন শহরে, পরিণত হয়েছে গার্মেন্টিস শ্রমিকে। উপায়ান্তর না পেয়ে বিলের মাছ ধরে বিক্রি করাকে

পেশা হিসেবে নিয়েছে বেশ কিছু মানুষ। জলাবদ্ধতার কারণে এলাকায় কর্মসংস্থান না থাকায় আপনাপন পেশার পরিবর্তন ঘটেছে অধিকাংশ মানুষের।

জলাবদ্ধতার সময় আধপেটা খেয়ে বেঁচে থাকাই সকলের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষার্থে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে সকলে। চাল যদিওবা যোগাড় হয় রান্না করার জন্য নেই জ্বালানি কিংবা চুলা বা রান্নাঘর। কি ধনী, কি গরীব অর্ধসিদ্ধ-বিস্বাদ খাবার খেয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকে জলাবদ্ধ অঞ্চলের মানুষ। পানিতে সবকিছু নিমজ্জিত থাকে বলে কেউ মারা গেলে তাকে দাফন করার উপযুক্ত জায়গারও অভাব দেখা দেয়।

চারিদিকে, এমনকি ঘরের মধ্যেও দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত পঁচা পানি। নলকূপগুলোও পানিতে নিমজ্জিত- তাই খাবার পানির ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় মারাত্মক সংকট। কোন উপায়ান্তর না দেখে জেনেশুনে আর্সেনিকযুক্ত বিষাক্ত (লাল রঙ করা) নলকূপের পানি খাচ্ছে এলাকার মানুষ।

কেসস্টাডি- ২
জলাবদ্ধতা মাঠপাড়ার মানুষগুলোর সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে

মনিরামপুর উপজেলার মাঠপাড়া গ্রামের রাজ আলী গাজী। বয়স সত্তুর ছুঁই ছুঁই। তবুও শ্মশ্রুমণ্ডিত রাজ আলী বেশ সুঠামদেহী। ৮ ছেলে আর ৩ মেয়ের বাবা সে। ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী আর পোতা-পুতনী মিলে এখন সর্বসাকুল্যে ৫০ জন একই গোষ্ঠীতে। মাঠপাড়া গ্রামের কাঁচা সড়ক থেকে ৫০ গজ দূরে তার বাড়ি। জলাবদ্ধতায় এই বর্ধিষ্ণু পরিবারের সবগুলো ঘরই পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। ধানের গোলার অর্ধাংশই ডুবে যায় পানিতে। পলগাদা পঁচে পানির রং হয়ে যায় হলুদাভ। তার বাড়ীর চারধারেই পানি। বাড়ীর গায় তার একটি রাইস মিল ছিল। এখন আর নেই। ১৫ বিঘা জমিতে ধান হতো তার, পাট জন্মাতো ২৫ কাঠায়। জলাবদ্ধতার কারণে এখন তা কেবলই স্বপ্ন। বছরের পর বছর কিনে খেয়ে খেয়ে সর্বশান্ত হয়েছে সে। কোন কাজ নেই রাজ আলীর। বদনা, ছিপ বড়শি হাতে রাজ আলী বললেন, 'সারাদিন পানির কোলাচে বসে মাছধরি আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি পানিতে তলিয়ে থাকা আমার জমিজমা'।

মাঠপাড়া গ্রামে আনসার আলী তার ৬ বিঘা জমিতে কিছুই করতে পারেনি এবার। তার ভিটে বাড়ীর জমিই ১০ কাঠা। সবই তলিয়ে গেছে পানিতে। সংসারে লোকসংখ্যা ৭ জন। বসবাসের অনুপযোগী হওয়ায় এবং এলাকায় কাজের সুযোগ না থাকায় তার ছেলেরা বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে গেছে অন্যত্র। জলাবদ্ধতার কারণে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে তার সাজানো গোছানো স্বপ্নের সংসার। জলাবদ্ধতা কেড়ে নিয়েছে তার সকল কর্মশক্তি। চাষের জমি ও ভিটা-মাটি হারিয়ে কৃষক আনসার আলী এখন অসহায় অক্ষম মানুষে পরিণত হয়েছে।

সুপেয় পানি সংকটের পাশাপাশি শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও বিভিন্ন ভিটামিনযুক্ত সবজি সংগ্রহের অক্ষমতার কারণে এলাকার জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকীর মধ্যে পড়ে। সর্দি-কাশি, জ্বর-টায়ফয়েড, কলেরা-ডায়রিয়া, আমাশয়সহ বিভিন্ন পানিবাহিত পেটেরপীড়ার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। খোসপাঁচড়া, চুলকানিসহ বিভিন্ন চর্ম রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। বিশেষ করে মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধরা সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির মধ্যে পড়ে, অপুষ্টির চিহ্ন দেখা দেয় তাদের চোখে-মুখে।

কেসস্টাডি- ৩.

জায়গা নেই-জমি নেই, আমার সরকারেরও প্রয়োজন নেই

"জায়গা নেই-জমি নেই, আমার সরকারেরও প্রয়োজন নেই। আমি ভিক্ষা করি, জলাবদ্ধতার কারণে কেউ ভিক্ষাও দিতে চায় না। চেয়ারম্যান আমাকে বয়স্ক ভাতা দেয়নি-এবার আর ভোট দিতেও যাব না"- একান্ত মনকষ্টে কথাগুলো বলেন কেশবপুর উপজেলার জলাবদ্ধ হদ গ্রামের ৬২ বছরের বৃদ্ধা আনোয়ারা। জলাবদ্ধতার কারণে প্রতি বছর বর্ষা কালে তার মাটির ঘরটি ভেঙ্গে পড়ে, উঠোনে পানি উঠে। গোসল করতে হয় পঁচা পানিতে সে কারণে আনোয়ারার হাতে পায়ে রয়েছে চুলকানি। জলাবদ্ধতার কারণে এলাকায় কোন কাজ নেই বলে তার ছেলেরাও বেকার। তারা নিজেরাই ছেলেমেয়ে নিয়ে অনাহারে থাকে, আনোয়ারাকে খেতে দিবে কিভাবে ? কোন উপায় নেই তাই ভিক্ষাবৃত্তি এখন বিধবা আনোয়ারার একমাত্র পেশা। জলাবদ্ধতার সময় পুরো হদ গ্রামের দুই-তিনটা উঁচু বাড়ি ছাড়া সকল বাড়িতে পানি উঠে যায়। কৃষি জমি, রাস্তাঘাট, ফসলের ক্ষেত সব ডুবে একাকার হয়ে যায়। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন, কর্মহীন বেকারে পরিণত হয় গ্রামের জনগণ। কেবল জলাবদ্ধ সমস্যার কারণে এই গ্রামের মোহর আলী সরদার (৬৫), লষ্কর মোল্যা (৫৬), আমির মোল্যা (৬৪), মাহতাব বিশ্বাস (৬৫), মোনতাজ ঢালী (৬৪), ইনতাজ ঢালী (৬২) হদ গ্রাম থেকে স্থানান্তর হয়ে পরিবার পরিজনসহ স্থায়ী ভাবে অন্য এলাকায় যেয়ে বসবাস

অনাহার, অভাব-অনটন, কর্মহীনতা, পরিবার থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে ভেঙ্গে যাচ্ছে জলাবদ্ধ অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবার; বিলীন হচ্ছে যৌথপরিবার ব্যবস্থা। বাড়ছে নারী নির্যাতন। জলাবদ্ধ এলাকায় কেউ ছেলে বা মেয়ে বিয়ে দিতে চায়না। এ অঞ্চলে কেউ বেড়াতে আসে না। নিজেদের অসহায়ত্বের প্রকাশ পাবে বলে জলাবদ্ধতার সময়ে এ এলাকার কেউ আত্মীয় বাড়িতেও বেড়াতে যায়না। লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট হওয়ায় এসব এলাকায় শিক্ষার হারও জাতীয় শিক্ষা হারের তুলনায় কম। জীবিকার প্রয়োজনে শিশুরাও পিতা-মাতার সাহায্যে জ্বালানি, পানীয়জল বা খাদ্যের অন্বেষণে শ্রম দিতে বাধ্য হয়,

কেসস্টাডি- ৪.

জলাবদ্ধতার কারণে বসবাসের উপযোগিতা হারাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় জনপদ

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার রংপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম মুজারঘুটা। বিল ডাকাতিয়ার মধ্যে অবস্থিত এই গ্রামটি দীর্ঘকাল যাবত জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত। এই গ্রামের কোন জমিতে আমন ফসল হয় না। বর্ষা কালে গ্রামের সকল বাড়িঘর প্লাবিত হয়। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি এবং গ্রামের বাইরে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাড়ায় ছোট ডিঙিনৌকা। জলাবদ্ধতার কারণে গ্রামটির জনজীবন মারাত্মক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গ্রামটিতে বসবাসের সুযোগ সুবিধা ক্রমান্বয়ে লোপ পাচ্ছে। সে কারণে ধীরে ধীরে গ্রামের লোকজন স্থানান্তর হয়ে যাচ্ছে। ফলে গ্রামের জনসংখ্যাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। ১৯৯১ সালের বাংলাদেশ সরকারের আদমশুমারী অনুযায়ী এই গ্রামে মোট লোকসংখ্যা ছিল ৪৬১ জন। ২০০১ সালের গনণা অনুযায়ী দেখা যায় এই গ্রামের জনসংখ্যা কমে দাড়িয়েছে ৩৬৪ জনে। জাতীয় ভাবে যেখানে সারা দেশে জনসংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে মুজারঘুটা গ্রামে জনসংখ্যা ১০ বছরে বৃদ্ধি না পেয়ে বরং ৯৭ জন কমে গিয়েছে। এই পরিসংখ্যানে বোঝা যায় জলাবদ্ধতার কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের মানুষেরা অন্যত্র স্থানান্তর (Migration) হচ্ছে।

ফলে তাদের লেখাপড়া ব্যাহত হয়। জলাবদ্ধতার সময় গ্রামগুলো হয়ে পড়ে একেকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

প্রতিনিয়ত ক্ষুধা-দারিদ্র্যের ছোবলে এলাকার মানুষগুলো হয়ে পড়েছে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক। নিজ নিজ পরিবার সামলাতেই ব্যস্ত সকলে। সামাজিক অনুশাসন বা সামাজিক বন্ধন আর যেন আগের মত নেই। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডতেও যেন তেমন কারো অংশগ্রহনের সময় সুযোগ বা আগ্রহ নেই।

দৈনন্দিন নানা সমস্যা, পর্যাপ্ত সরকারী সাহায্যের অভাব, জলাবদ্ধতা নিরসনে অনিশ্চয়তা-উদ্যোগহীনতা এবং জলাবদ্ধতার ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ায় আশাহত হয়ে অনেকেই নিরবে এলাকা ত্যাগ করছে। ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে এ এলাকার জনবসতি।

উঁচু রাস্তার উপর আশ্রয় নেয়া জলাবদ্ধ এলাকার মানুষ

বর্তমানে দমকলের সাহায্যে পানি সেচে ফেলে যদিওবা কোন কোন অঞ্চলে কেবল শুষ্ক মৌসুমে বোরো জাতীয় ধানের চাষ করা সম্ভব হচ্ছে কিন্তু পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও সমুদ্র জোয়ারের ক্রমান্বয়ে উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে এ এলাকার জলাবদ্ধতা দীর্ঘস্থায়ী হবার ও ব্যাপক বিস্তারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এলাকাটি ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে জলমগ্ন ও জনবসতির অযোগ্য হবার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতায় বিপর্যস্ত জনজীবন, পরিবেশ, উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজচিত্র তারই নমুনা বহন করে।

৫. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতার কারণ

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল এলাকা বিভিন্ন কারণে জলাবদ্ধ কবলিত হয়ে পড়েছে। এ এলাকায় নিত্য নতুন সমস্যার আবির্ভাব ঘটায় পরিস্থিতি আরও জটিলতর রূপ ধারণ করছে। নিম্নে জলাবদ্ধতার কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

৫.১ উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প

উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প পোল্ডার হিসেবে পরিচিত। পোল্ডার হলো বাঁধ দিয়ে একটা নির্দিষ্ট এলাকাকে ঘিরে ফেলা যাতে নদীর জোয়ার-ভাটার পানি ওই নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যে নিয়ন্ত্রিতভাবে যাওয়া-আসা করতে পারে।

গত শতাব্দীর ৬০ এর দশকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সারা বছর ধরে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের জন্য জলাভূমিকে শুষ্কভূমিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীকারী

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও ডাচ সরকারের প্রযুক্তিগত সহায়তায় এ প্রকল্প সম্পন্ন হয়। এ প্রকল্পে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১,৫৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় বাঁধের মাধ্যমে ৩৭টি পোল্ডার ও ২৮২টি স্লুইসগেট নির্মাণ করা হয়। প্রকল্প প্রণয়নের সময় এ এলাকার পরিবেশ ও অধিক ভঙ্গুর প্রতিবেশকে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি। ফলে প্রকল্প শেষ হবার পর কয়েক বছর এলাকায় ফসল ফলানো সম্ভব হলেও মাত্র এক দশক পর থেকে এলাকায় নানারূপ পরিবেশ বিপর্যয় (জলাবদ্ধতা ও নদী ভরাট সমস্যা) দেখা দিতে শুরু করে। এলাকার উৎপাদন বিশেষ করে ধান ও উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন ক্রমশ:হ্রাস পেতে থাকে এবং জলাবদ্ধতার সূত্রপাত হয় ।

মূলত: পদ্মা, মেঘনা ও যমুনাসহ অন্যান্য নদী দিয়ে পানির সাথে বছরে প্রায় ২০০ কোটি টন পলি মেঘনা নদীর মোহনা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে (কোলম্যান-১৯৬৯)। এ পলির একাংশ সামুদ্রিক জোয়ারের মাধ্যমে অসংখ্য জোয়ার ভাটার খাড়ি নদীর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে উঠে আসে। উপকূলীয় বাঁধ নির্মানের পূর্বে জোয়ার বাহিত এই পলি নদীসংলগ্ন প্লাবনভূমিতে অবক্ষেপিত হতো এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ভূমিগঠন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করত। কিন্তু উপকূলীয় বাঁধ নির্মিত হওয়াতে এ অঞ্চলে ভূমিগঠন সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই উপকূলীয় জলাভূমির সঙ্গে নদীগুলোর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে। সে কারণে জোয়ার বাহিত পলি এ অঞ্চলের জলাভূমিতে সঞ্চিত না হয়ে নদীতে অবক্ষেপিত হয়ে নদী ভরাট হতে থাকে। সর্বপ্রথম এ সকল নদীর প্রান্তসীমায় পলি পড়ে ক্রমান্বয়ে নদীর তলদেশ নদীসংলগ্ন বিলের তুলনায় উঁচু হয়ে যায় ফলে বিলের পানি নিষ্কাশিত হতে না পেরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। আবার কোন কোন অঞ্চলে বিলের মধ্যে জমে থাকা বৃষ্টিরপানির সাথে উচ্চ জোয়ারের লবণাক্তপানি ঢুকে জলাবদ্ধতা সমস্যা আরো দীর্ঘতর হচ্ছে। পলিজমে এভাবে ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলের নদীসমূহ তার নাব্যতা হারাচ্ছে ও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। জলাবদ্ধ এলাকাও দিনে দিনে সম্প্রসারিত হচ্ছে। আর এ ক্রমবর্ধমান নদী ভরাট প্রক্রিয়া রোধ করা না গেলে কখনই দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব হবে না।

৫.২ উজানের সংগে নদীসমূহের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া

বিভিন্ন কারণে গঙ্গা বা পদ্মার সাথে দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার নদীগুলোর বিভিন্ন সময়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নীচে আলোচনা করা হলো ঃ

ক) গঙ্গা/পদ্মা নদীর গতিমুখ পরিবর্তন

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ ছিল খুলনা ও চব্বিশ পরগনা জেলার উপর দিয়ে। পরবর্তীতে প্রাকৃতিক কারণে ধীরে ধীরে গঙ্গা/পদ্মা নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তার গতিমুখ পরিবর্তন করতে থাকে। ফলে এ অঞ্চলের নদী সমূহে উজানের পানি প্রবাহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। নদীর পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় নদী সমূহের গভীরতা, আকার ও আয়তনের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। পাশাপাশি গঙ্গা নদীর গতিমুখ পরিবর্তনের ফলে এ অঞ্চলে মিষ্টিপানি প্রবাহের

চিত্র-৩ : পদ্মা নদীর গতিমুখ পরিবর্তন

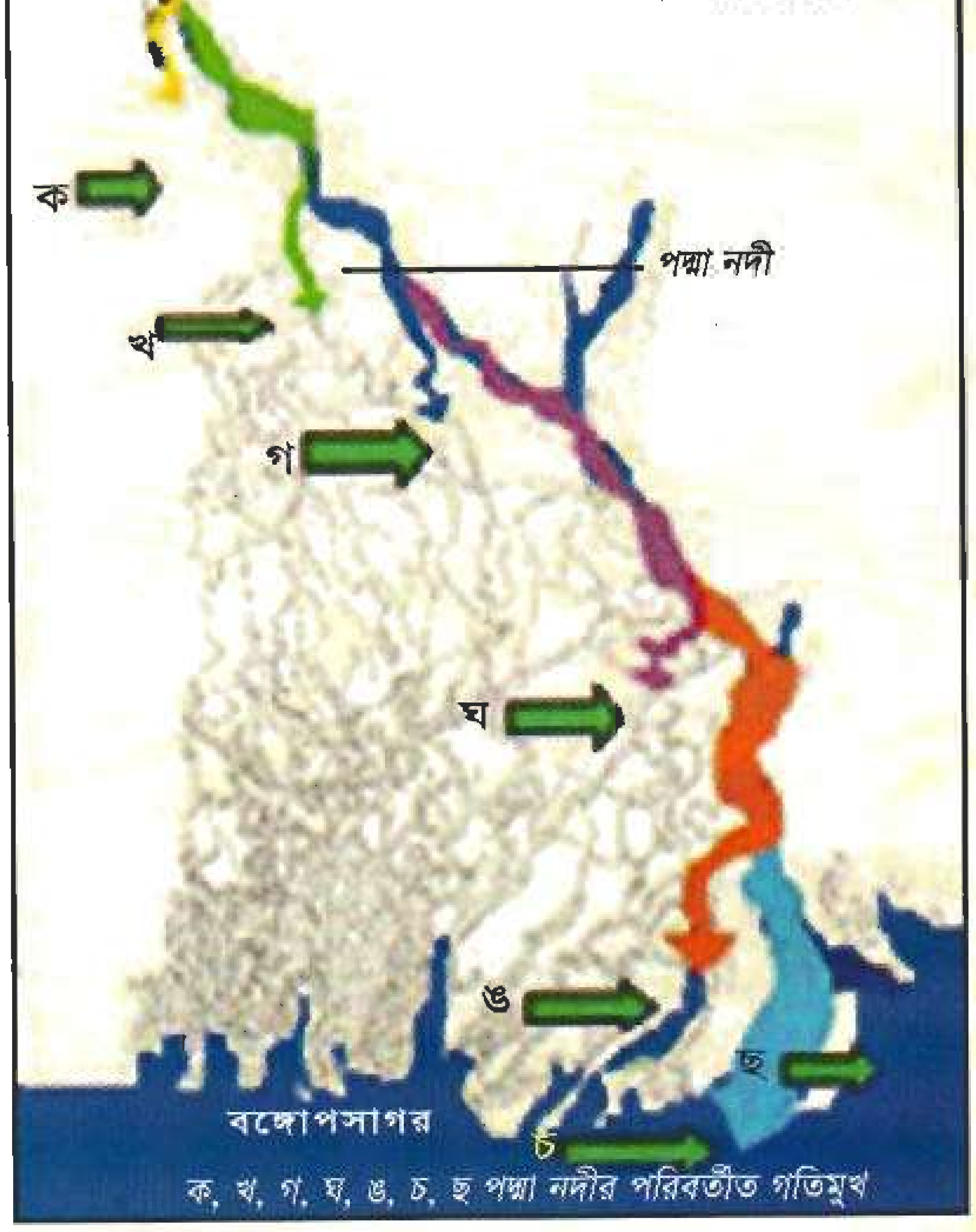

সর্বপ্রথম বিপর্যয় ঘটে। মিষ্টিপানি নির্ভরশীল কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, জোয়ার বাহিত পলি অপসারণ বাঁধগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং উজান বাহিত পানি থেকে নদী অববাহিকার প্লাবনভূমি বঞ্চিত হয়।

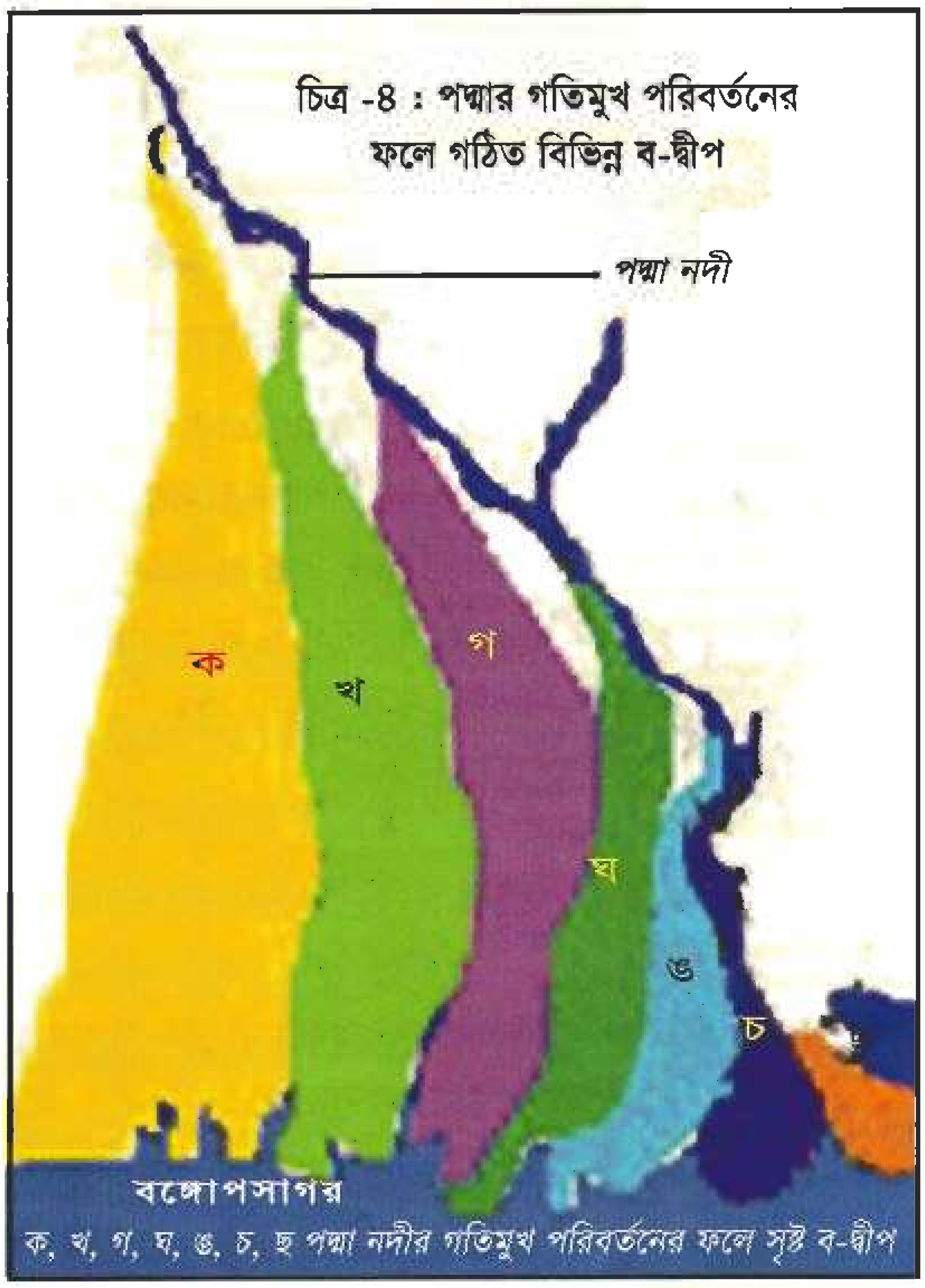

চিত্র -৪ : পদ্মার গতিমুখ পরিবর্তনের ফলে গঠিত বিভিন্ন ব-দ্বীপ

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ পদ্মা নদীর গতিমুখ পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ব-দ্বীপ

খ) মাথাভাঙ্গা নদীর অপমৃত্যু

উনবিংশ শতাব্দীতে গঙ্গার শাখা নদী মাথাভাঙ্গার উৎস মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এ অঞ্চলের নদীসমূহ উজানের পানি প্রবাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী কোলকাতা থেকে উত্তর বাংলায় যাতায়াতের জন্য মাথাভাঙ্গা নদী ব্যবহার করতো। মাথাভাঙ্গার তীব্র স্রোতে প্রায়শ বিভিন্ন ধরনের নৌ-দুর্ঘটনা ঘটতো এবং এ দুর্ঘটনায় বেশ প্রাণহানীও হত। তাই মাথাভাঙ্গা নদীর তীব্র স্রোত হ্রাস করার জন্য নদীর উৎস মুখে মাটিভর্তি বড় বড় নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হত, যা সাময়িকভাবে মাথাভাঙ্গার তীব্র স্রোত হ্রাস করলেও পরবর্তীকালে মাথাভাঙ্গা নদীর উৎস মুখে স্থায়ীভাবে চর পড়তে সাহায্য করে। ধীরে ধীরে মাথাভাঙ্গা নদী গঙ্গা নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বৃটিশ সরকার মাথাভাঙ্গা নদীকে পুনর্জীবিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেন। কিন্তু কোনটাই কার্যকর হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯১৯ সালে বিশ্ব বিখ্যাত পানি বিজ্ঞানী উইলিয়াম কক্স মাথাভাঙ্গা নদীর নিম্নাংশে গঙ্গা নদীতে বাঁধ দিয়ে বাঁধের উপরাংশে পানির উচ্চতা ৭ ফুট বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখেন এবং এর মাধ্যমে মাথাভাঙ্গা নদী পুনর্জীবিত হবে বলে তিনি তার পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা বৃটিশ সরকার বাস্তবে রূপায়ন করেনি।

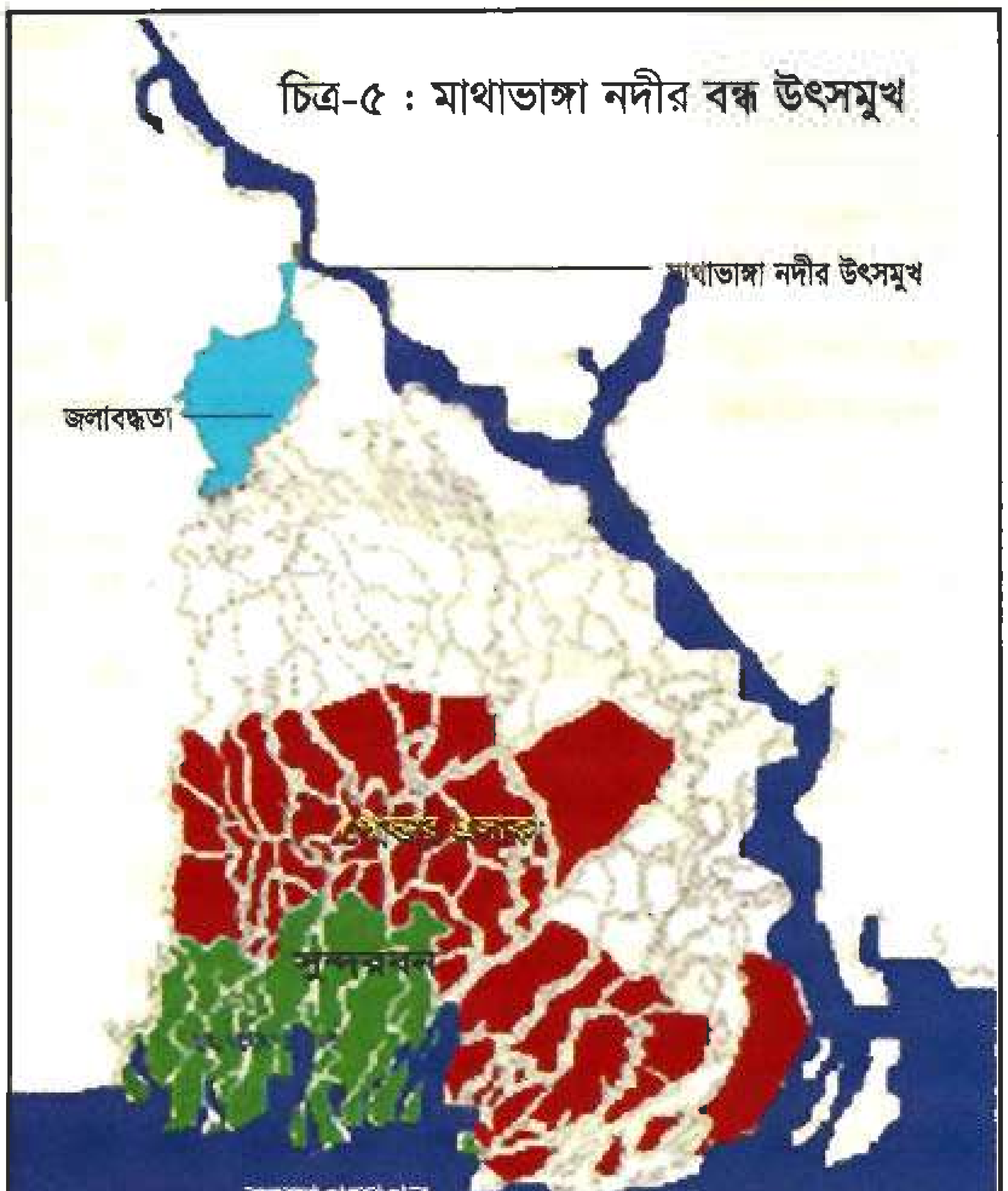

চিত্র-৫ : মাথাভাঙ্গা নদীর বন্ধ উৎসমুখ

উনবিংশ শতাব্দীতে মাথাভাঙ্গা নদীর এ অস্বাভাবিক মৃত্যুর ফলে যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় ঘটে। কলেরা ও ম্যালেরিয়া মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজার হাজার লোকের অকাল মৃত্যু হয়। ঠিক একইভাবে কৃষির উপরেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। সুন্দরবনের উপরেও এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

যেমন- সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ অর্থাৎ মাথাভাঙ্গা নদীর শাখা নদী কপোতাক্ষ ও বেতনা নদীর উপর নির্ভরশীল এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের গাছপালার ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন হয়, কম লবণসহনশীল গাছের পরিবর্তে অধিক লবণসহনশীল গাছের বিস্তার ঘটে। মাথাভাঙ্গা নদীর অববাহিকা তথা কপোতাক্ষ, ভৈরব এবং বেতনা নদীর উপর নির্ভরশীল এলাকায় মিষ্টিপানির দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয়। সাগর থেকে লবণপানি উপকূল অঞ্চলে ঢুকে পড়ে উপকূলীয় জলাভূমির সম্পূর্ণ এলাকা গ্রাস করে ফেলে।

উজানের প্রবাহ না থাকায় ভাটার সময় এ অঞ্চলের সকল নদীর পানি প্রবাহ ও স্রোতের গতি মারাত্মকভাবে কমে যায়। অন্যদিকে সমুদ্রের জোয়ারের পানির সঙ্গে বিভিন্ন কারণে পলিমাটির আগমনের হারও বৃদ্ধি পায়। এই পলি নদীর চর ও নদীবক্ষে জমতে শুরু করে। উজানের স্রোত না থাকায় ভাটার সময় নদী বক্ষে সঞ্চিত পলি আর অপসারিত হতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতা ও প্রস্থ লোপ পেতে থাকে। বর্তমানে গড়াই অববাহিকা অঞ্চলও উজান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, ফলে সেখানেও মাথাভাঙ্গা অববাহিকার অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হতে চলেছে।

গ) ফারাক্কা বাঁধ

১৯১৫ সালে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানির প্রবাহ ছিল প্রায় ১ লাখ ৮৫ হাজার কিউসেক। ষাটের দশকের প্রথম দিকে যখন ফারাক্কা ব্যারাজের নির্মাণ কাজ শুরু হয় তখন এই পানি প্রবাহের পরিমান ছিল ১লাখ ৩৫ হাজার কিউসেক। ১৯৭৪ সালে এই প্রবাহ কমে দাঁড়ায় ৮৫ হাজার কিউসেক। বর্তমানে এ পানি প্রবাহ কমে ৬৭/৬৮ হাজার কিউসেকে দাঁড়িয়েছে। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে পানি প্রবাহ কমে যাওয়ার একমাত্র কারণ ভারত গঙ্গা থেকে সময়ের সাথে সাথে বেশি বেশি করে পানি প্রত্যাহার করছে। ফারাক্কার উজানে কোসি, মহাকালি ইত্যাদি নদীতে বাঁধ এবং পাম্পের মাধ্যমে ভারত একতরফাভাবে পানি উত্তোলন করে যাচ্ছে। ফলে ক্রমাগতভাবে গঙ্গার নিম্ন অববাহিকার প্রবাহ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। আমরা যদি ভারতের পানি প্রত্যাহারের চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাই ভারত গঙ্গা থেকে দুই প্রক্রিয়ায় পানি প্রত্যাহার করছে-

প্রথমত ঃ বিহার, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও মধ্যপ্রদেশ এলাকায় কৃষিকাজের জন্য বাঁধ ও পাম্পের সাহায্যে পানি প্রত্যাহার।

দ্বিতীয়ত ঃ কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার জন্যে ফিডার ক্যানেলের মাধ্যমে পানি প্রত্যাহার এবং তা ভাগিরথীর মাধ্যমে হুগলী নদীতে প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য প্রবাহিত করা।

বর্তমানে ভারতের সাথে বাংলাদেশের ৩০ বছর মেয়াদী যে পানি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা শুধুমাত্র ফরাক্কা পয়েন্টে প্রাপ্ত পানির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। ফারাক্কা পানি বন্টন চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার সর্বনিম্ন প্রবাহের সময় ২৫ হাজার কিউসেক পানি পাবে। প্রকাশ থাকে যে, ১৯৭৪ সালে ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার আগে ভারত বাংলাদেশ গঙ্গার পানি বন্টন বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এই সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার সর্বনিম্ন প্রবাহের সময় ৪৪ হাজার ৫০০ কিউসেক পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পায়। তবে চুক্তিটি ছিল খুবই সাময়িক। তাছাড়া ১৯৭৭ সালে ভারত বাংলাদেশ গঙ্গার পানি বন্টন বিষয়ে আরো একটি স্বল্পমেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার সর্বনিম্ন প্রবাহের সময় ৩৪ হাজার ৫০০ কিউসেক পানি লাভ করে। উপরোক্ত তথ্য গুলো বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ফারাক্কা পয়েন্টে শুষ্ক মৌসুমে ক্রমাগতভাবে পানি প্রবাহের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে যা ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য দুঃশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। কারণ গঙ্গা অববাহিকায় কৃষিকাজ এবং কোলকাতা বন্দরের নব্যতা রক্ষার জন্য ভারত

ফারাক্কা পানি বন্টন চুক্তি অনুযায়ী
১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ মে সময়কালে গঙ্গার পানি বিভাজন

সময়কাল		১৯৮৯-৮৮ সনের মোট প্রবাহের গড়, কিউসেক	ভারতের অংশ কিউসেকে	বাংলাদেশের অংশ কিউসেকে
জনুয়ারী	০১-১০	১,০৭,৫১৬	৪০,০০০	৬৭,৫১৬
	১১-২০	৯৭,৬৭৩	৪০,০০০	৫৭,৬৭৩
	২১-৩১	৯০,১৫৪	৪০,০০০	৫০,১৫৪
ফেব্রুয়ারী	০১-১০	৮৬,৩২৩	৪০,০০০	৪৬,৩২৩
	১১-২০	৮২,৮৫৯	৪০,০০০	৪২,৮৫৯
	২১-২৮/২৯	৭৯,১০৬	৪০,০০০	৩৯,১০৬
মার্চ	০১-১০	৭৪,৪১৯	৩৯,৪১৯	৩৫,০০০
	১১-২০	৬৮,৯৩১	৩৩,৯৩১	৩৫,০০০
	২১-৩১	৬৪,৬৮৮	৩৫,০০০	২৯,৬৮৮
এপ্রিল	০১-১০	৬৩,১৮০	২৮,১৮০	২৫,০০০
	১১-২০	৬২,৬৩৩	৩৫,০০০	২৭, ৬৩৩
	২১-৩০	৬০,৯৯২	২৫, ৯৯২	৩৫,০০০
মে	০১-১০	৬৭,৩৫১	৩৫,০০০	৩২,৩৫১
	১১-২০	৭৩,৫৯০	৩৮,৫৯০	৩৫,০০০
	২১-৩১	৮১,৮৫৪	৪০,০০০	৪১,৮৫৪

ক্রমান্বয়ে অধিকহারে পানি প্রত্যাহার করে চলেছে। ফলে বাংলাদেশ তার ন্যায্য পানি প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের প্রয়োজন গঙ্গার পানি বন্টন বিষয়ে একটি দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি করা। এ প্রসঙ্গে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সিন্ধু নদ চুক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে এবং বাংলাদেশও অনুরূপভাবে গঙ্গার পানি বন্টন বিষয়ে ভারতের সংগে একটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। তাছাড়া চুক্তিটি শুধুমাত্র ফারাক্কা পয়েন্টের প্রাপ্ত পানির উপর ভিত্তি না করে বরং গঙ্গা অববাহিকায় প্রবাহিত মোট পানির সাপেক্ষে হওয়া উচিত। প্রয়োজনে এ বিষয়ে ভারত বাংলাদেশ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট দেশ সমূহের মধ্যে ত্রিদেশীয় পানি বন্টন চুক্তি হতে পারে।

১৯৭৪ সালে পানি বন্টন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ ৪৪ হাজার ৫০০ কিউসেক পানি পেয়েছিল, কিন্তু বর্তমান চুক্তিতে বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে ১লা এপ্রিল থেকে ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র ২৫ হাজার কিউসেক এবং ১১ই এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত ২৭ হাজার ৬৬৩ কিউসেক পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেয়েছে। বর্তমান চুক্তি শেষ হলে আগামীতে বাংলাদেশ আরো কম পানি পেতে পারে। উল্লেখ্য বর্তমানের গঙ্গা চুক্তিটি স্বাক্ষর হওয়ার আগে এবং ১৯৭৭ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বেশ কয়েক বছর পানি বন্টনের বিষয়টি চুক্তি বিহীন অবস্থায় ছিল। এই সময় কোন কোন বৎসরে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশ মাত্র ১০ থেকে ১২ হাজার কিউসেক পানি পেয়েছে। উল্লেখ্য শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার প্রবাহ হ্রাস পাবার কারণে গড়াই ও গড়াই এর শাখা নদীতে পলির অবক্ষেপন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে উজান প্রবাহ না থাকার কারণে ভাটার চাপও হ্রাস পেয়েছে। ফলে জোয়ারবাহিত পলি নদী থেকে অপসারিত হতে পারছে না। এখনই যদি গড়াই-এর উৎসমুখ সচল না রাখা যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে গড়াই অববাহিকার পরিণতি দাঁড়াবে মাথাভাঙ্গা অববাহিকার অনুরূপ এবং গড়াই অববাহিকায়ও ভয়াবহ জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হবে।

৫.৩ ভূমির নিম্নগমন

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি বসে যাওয়ার প্রবণতা কয়েক শতক ধরে লক্ষ্য করা গেছে। একশ বছর পূর্বে কর্ণেল গ্যাসট্রেল-এর আবিস্কার এ সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভূ-ত্বকের ৬ মিটার নিচে খননকার্য চালানো কালে তিনি এখানে প্রাচীন অরণ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। তিনি দেখেন বিভিন্ন আকারের গাছ তার মূল, কান্ড, শাখা-প্রশাখা ও সবুজ পাতা সহ প্রোথিত অবস্থায় মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। খুলনার "বিল" ব্যবস্থা সম্পর্কে এল আর ফকাস (L.R.Fowcus) তাঁর Final report on the survey and settlement operation in the district of Khulna (১৯২০-২৬) নামক পুস্তকে ভূমি বসে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতিকালে ড. মনিরুল হকের গবেষণা থেকে জানা যায় এই জলাভূমির অধিকাংশ এলাকায় বছরে ১ থেকে ২ সে.মি. ভূমির নিম্নগমন হচ্ছে যা আমেরিকার মিসিসিপি ব-দ্বীপের ভূমি বসে যাওয়ার মাত্রার অনুরূপ। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে জোয়ারের পলি এই প্লাবনভূমিতে অবক্ষেপিত হত বলে ভূমির নিম্নগমনের হারের তুলনায় ভূমিগঠন বেশী হত । এই প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে ভূমির উচ্চতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু উপকূলীয় বাঁধ নির্মানের পরে এই ভূমিগঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। বিগত ৩/৪ দশক ধরে ভূমির একতরফা নিম্নগমনের ফলে পোল্ডারের অভ্যন্তরের ভূমি ক্রমান্বয়ে নীচু হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে পোল্ডারের বাঁধের বাইরে পলি জমে উঁচু হয়ে যাচ্ছে। সে কারণে পোল্ডারের অংশে জলাবদ্ধতার তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫.৪ অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ

পোল্ডার নির্মাণের পূর্বে এ অঞ্চলে যাতায়াত, মালামাল পরিবহন ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল নদীপথ এবং বাহন ছিল নৌকা। কিন্তু পোল্ডার নির্মাণের পর কাঁচা ভেড়িবাঁধগুলি পায়ে হাঁটা পথ হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তীকালে এ অঞ্চলে আরো রাস্তাঘাট, কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মিত হয়েছে। ফলে এলাকার পানি নিষ্কাশনে যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এ অঞ্চলের ভূমির ঢাল উত্তর-দক্ষিণ বরাবর। কিন্তু রাস্তাগুলি অধিকাংশ পূর্ব-পশ্চিম মুখী করে নির্মান করা হয়েছে। রাস্তা নির্মাণের সময়ে অসংখ্য পানি নিষ্কাশনের খাল বা নালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর সে তুলনায় খুব কম সংখ্যক ব্রীজ বা কালভার্ট নির্মান করা হয়েছে। আবার অধিকাংশ কালভার্টের তলদেশ প্রয়োজনীয় গভীরতার তুলনায় অনেক উঁচু করে নির্মাণ করা হয়েছে। যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্য অনেক ছোট বড় নদীতে নির্মাণ করা হয়েছে ব্রীজ। ব্রীজ নির্মাণ কাজের সুবিধার জন্য নদীর দুই পাশে বাঁধ দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে নদীর প্রস্থ কমিয়ে ফেলা হয়েছে। তাছাড়া নদীর মধ্যে নির্মিত ব্রীজের পিলার সমূহ নদীর প্রবাহে মারাত্মক বাঁধার সৃষ্টি করেছে। ফলে নদীর নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। এ সকল অপরিকল্পিত অবকাঠামো জলাবদ্ধতা প্রসারে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

৫.৫ চিংড়ি চাষ

উপকূলীয় জলাভূমির অধিকাংশ জমিতে বর্তমানে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। বৃহত্তর খুলনা জেলার প্রায় ৪২ শতাংশ কৃষিজমি বর্তমানে চিংড়ি চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। স্লুইসগেটের রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ এবং চিংড়ি চাষীরা যোগসাজসে চিংড়ি ঘেরে প্রয়োজন মাফিক লোনাপানি উঠানামা করায়। যার ফলে অনেক সময় চিংড়ি ঘেরের পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রকাশ থাকে যে, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল লোনাপানি রোধ করে সারা বছর উচ্চ ফলনশীল ধান উৎপাদন করার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো সেই উপকূলীয় বাঁধ এখন ব্যবহৃত হচ্ছে পোল্ডারের মধ্যে লোনাপানি ধরে রেখে চিংড়ি চাষের জন্য। তাছাড়া প্রায়শ স্লুইসগেট সংলগ্ন নিষ্কাশন খাল গুলো সরকার জলমহাল হিসেবে চিংড়িচাষীদের কাছে ইজারা প্রদান করে থাকে। যার ফলে জনগণের প্রয়োজন মাফিক নিষ্কাশন খালের মাধ্যমে খালের উজানের বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে পারে না। চিংড়ি ঘেরের মধ্যে অবস্থিত সরকারি খাল ভেড়ী দিয়ে বেঁধে ফেলার কারণে বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি খালগুলো দিয়ে নিষ্কাশন হতে পারে না। যার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের হাজার হাজার হেক্টর জমি বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জলাবদ্ধ হয়ে থাকে।

৫.৬ জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে দ্বিমত থাকলেও বর্তমানে প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত যে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে উন্নত বিশ্বের জীবাশ্মজাত জ্বালানী নির্ভরতার কারণে আশংকাজনকহারে গ্রীনহাউজ গ্যাসের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় ভূ-মণ্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্বের জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। পৃথিবীর উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে কি পরিমাণ উচ্চতা বাড়ছে এবং পৃথিবীর সব জায়গায় সমান ভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা এ বিষয়ে এখনও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। Peltier and tushinghan;1989,1991. পরীক্ষা করে প্রমান করেছেন প্রতিবছর পৃথিবীব্যাপী সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ২.৪ মিলিমিটার করে বাড়ছে (IPCC Report-2001)। স্যাটেলাইট অল্টিমিটারের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে । একই ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন গ্রীন হাউজ গ্যাসের পরিমানও দিন দিন বাড়ছে (IPCC Report-2001)।

বিশেষজ্ঞগণের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি। বর্তমানে এ দেশের জলবায়ু স্বতন্ত্র ও অস্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। জলবায়ুর বর্তমান অবস্থা এবং বিরূপ আবহাওয়ার কারণে সংগঠিত কিছু সংবেদনশীল ঘটনায় বোঝা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

বাংলাদেশের জলবায়ুতে পানি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিপর্যয় দেখা যায়, যা এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকায় ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক পানি থাকলেও বাস্তবে পানি সম্পদের উপর এদেশের নিয়ন্ত্রণ খুব কম। জলবায়ুর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করলে অনুভব করা যায় এ দেশে প্রায়ই পানি সংক্রান্ত বিপর্যয় দেখা দেবে। বর্ষা মৌসুমে বন্যায় নীচু জমিগুলো প্লাবিত হবে। শুষ্ক মৌসুমে অনাবৃষ্টিতে নদী ও ভূ-গর্ভের পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার ফলে খরার প্রকোপ বাড়বে। শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানি প্রবাহ কমার কারণে ক্রমবর্ধমান লবণাক্তপানি মাটির আরো ভিতরে প্রবেশ করবে এবং উপকূলীয় জলাভূমি চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। অগভীর জলাধারেও লবণাক্ততার মাত্রা বাড়বে এবং উপকূল এলাকায় খাবার পানির পর্যাপ্ততা আরো কমে যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির মধ্যে অবস্থিত। এ এলাকার দরিদ্র

জনগণের পরিবর্তীত পরিস্থিতি এবং তার ফলে সংঘটিত আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা কম থাকায় জলবায়ু পরির্তনের ফলে তারা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে অন্ততঃ পৃথিবীর ৫টি দ্বীপ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। প্রায় ১৫ কোটি মানুষ হয়ে পড়বে বাস্তুচ্যুত। বাংলাদেশেরও একটি বড় অংশ (১৪-১৭ ভাগ) পানির নিচে তলিয়ে যাবে। এতে এ দেশের ২ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হবে। তথ্য মতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বাড়লে দেশের মোট আয়তনের ২২.৮৮৯ বর্গ কিলোমিটার (বৃহত্তর খুলনার ৬৫ ভাগ, বরিশালের ৯৯ ভাগ, সম্পূর্ণ পটুয়াখালি, নোয়াখালির ৪৪ভাগ ও ফরিদপুরের ১২ ভাগ এলাকা) পানিতে তলিয়ে যাবে। মালদ্বীপের মতন দেশের কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে বলে মত প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC) এর চেয়ারম্যান ড. রাজেন্দ্র । সার্ক আবহাওয়া গবেষনা কেন্দ্রের প্রাক্তন পরিচালক সাজেদুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড.আব্দুর রব এবং মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পরিবেশবিদ ড. হারুনর রশিদ খানও আইপিসিসির মতের সাথে একমত পোষন করেন (আজকের কাগজ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩)। ২০০১ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব কফি আনান বাংলাদেশ সফরে এসে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত এক সেমিনারে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন "বাংলাদেশের সামনে এক মহা প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট এই দুর্যোগের ধ্বংসকারী প্রভাব বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের উপরেই হবে সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী বিরাট এলাকা সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সুন্দরবন এবং তার বিশ্ববিশ্রুত রয়েল বেঙ্গল টাইগার"।

ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ার ফলে মেরু অঞ্চলের এমনকি হিমালয়ের জমাটকৃত বরফ অতিমাত্রায় গলে সমুদ্র পানির পরিমান ও সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায়ও এর প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এভাবে বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আগামী ১০/১৫ বছরের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল এলাকা সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে এলাকার মানুষ জোয়ারের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে।

উপকূলের যে সব উঁচু এলাকায় পূর্বে জোয়ারের পানি উঠতো না, সে সব এলাকায় এখন জোয়ারের পানি উঠছে। ফলে নদী বরাবর (বসতি এলাকার ধারে) আরও উঁচু করে বাঁধ দিতে হচ্ছে। এক দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিলগুলো ভূমির নিম্নগমনের ফলে ক্রমান্বয়ে নীচু হচ্ছে, অন্য দিকে জোয়ারের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দুটি কারণে ক্রমান্বয়ে জলাবদ্ধ এলাকা সম্প্রসারিত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে বিগত ৩০বছর ধরে প্রতি বছর এ অঞ্চলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৩ থেকে ৪ মিলিমিটার। অন্যদিকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে খুবই কম। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের ১ মিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চল সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে।

৫.৭ বন্যা

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে প্রতি বছরই বন্যা দেখা দিচ্ছে এবং এই বন্যার পানি নিষ্কাশিত হতে না পেরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে। অধিকাংশ সময় বন্যা জনপদ প্লাবিত করে পোল্ডারের ভিতর আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে দু'ধরনের বন্যা হচ্ছে:

পানিতে নিমজ্জিত বামনআলী রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলারোয়া, সাতক্ষীরা

(ক) ঢল পানির বন্যা (Flash Flood)

বহু বছর যাবত দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা বন্যা মুক্ত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ছিল। যতদূর জানা যায় ১৯৩৮ সালে এ অঞ্চলে সাময়িকভাবে ঢল পানির বন্যা দেখা দেয়। সে সময়ে গঙ্গা/পদ্মার পাড় উপচে পানি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে প্লাবিত করে। এর প্রায় ৬২ বছর পর ২০০০ সালে দক্ষিণ পশ্চিম এলাকার জনসাধারণ প্রবল ঢল পানির বন্যার মুখোমুখি হয়। লাখ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং বিপর্যস্ত হয় সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা। বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, ছোট নাগপুর এবং ফারাক্কার উপরাংশে পশ্চিম বাংলা ও বিহারে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। ফলে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জলাধারের অভ্যন্তরে পানির চাপ বাড়তে থাকায় এই সকল জলাধারে পানির চাপ কমানোর জন্য পরবর্তীতে জলাধারের কপাট খুলে দেওয়া হয়। তাছাড়া একই সঙ্গে ফারাক্কা বাঁধের উপরে গঙ্গা অববাহিকায় প্রবল বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, ১০৭ গেট বিশিষ্ট গঙ্গা বাঁধের দক্ষিণ অংশের ৫৩ টি গেট ইতোমধ্যে পলি পড়ে অকার্যকর হয়ে পড়ায় গঙ্গা বাঁধের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশনের ক্ষমতা ইতিমধ্যে বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। তাই জলাধার থেকে বের হওয়া পানি এবং গঙ্গার উপচে পড়া পানি পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, যশোর ও সাতক্ষীরার বিস্তীর্ণ এলাকাকে প্লাবিত করে ফেলে। এই বন্যার পর প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস, কোথাও কোথাও তার থেকে বেশী সময় ধরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এবং বিশেষ করে পোল্ডার অভ্যন্তরের পূর্বের জলাবদ্ধতা আরো ভয়ঙ্কররূপ নেয়। উল্লেখ্য, পলি অবক্ষেপন এবং সংস্কারের অভাবে এই অঞ্চলের অধিকাংশ নিষ্কাশন খালগুলো ইতিপূর্বে ভরাট হয়ে গেছে, যা এ জলাবদ্ধতাকে প্রলম্বিত করে এবং জনদুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলে।

২০০০ সালের ঢল পানির বন্যার পর অধিকাংশ লোক আশংকা প্রকাশ করেন যে, ফারাক্কার উপরে ও নীচে গঙ্গা অববাহিকার সীমান্ত সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অনুরূপ বন্যা ভবিষ্যতে বারবার দেখা দিতে পারে।

(খ) অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা

নিম্নচাপজনিত বা সাধারণভাবে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন নদীর অববাহিকায় বিশেষ করে কপোতাক্ষ, ভদ্রা, গজশ্রী, হরিহর, বুড়িভদ্রা ইত্যাদি নদীর অববাহিকায় ব্যাপক বন্যা দেখা দিচ্ছে (২০০২, ২০০৩ ও ২০০৪ সালের বন্যা)। এ অববাহিকায় বসবাসরত লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং জনজীবন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ নদী ইতিমধ্যে পলি অবক্ষেপনের ফলে ভরাট হওয়ার প্রেক্ষিতে তার নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে, যার ফলে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত হতে না পেরে লাখ লাখ হেক্টর জমি প্রতিবছর দীর্ঘসময় ধরে জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সমস্যা ক্রমান্বয়ে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

৬. জলাবদ্ধতা নিরসনে বাস্তবায়নকৃত সরকারী পদক্ষেপ সমূহের পর্যালোচনা

আশির দশকের শুরুতে পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি ও জোয়ার ভাটার প্লাবনভূমির সংযোগস্থল অর্থাৎ যশোরের নিম্নাংশে জলাবদ্ধতার সূচনা হয়। ক্রমান্বয়ে এই জলাবদ্ধতা নীচের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। অল্প দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে জলাবদ্ধতা ব্যাপক এলাকাকে গ্রাস করে ফেলে। একই সঙ্গে বাগেরহাট এবং খুলনা জেলার মোল্লাহাট, ফকিরহাট,রূপসা ও তেরখাদা অঞ্চলে কেন্দুয়াবিল খ্যাত এলাকায়ও জলাবদ্ধতার সূচনা হয়। প্রথম দিকে জনগণ মনে করে এ সমস্যা খুবই সাময়িক এবং সরকার যথাযথ উদ্যোগ নিয়ে সমস্যাটির দ্রুত সমাধান করবে। কিন্তু বাস্তবে সমস্যাটি ক্রমান্বয়ে জটিল এবং দীর্ঘতর হতে থাকে। এমতাবস্থায় জনগণ জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাতে থাকে এবং জনগনের এ দাবীর মুখে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার পরবর্তীতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। নিচে জলাবদ্ধতা নিরসনে বাস্তবায়নকৃত সরকারী পদক্ষেপ সমূহের সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করা হলোঃ

প্রথমতঃ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ১৯৮৫ সালে বিল ডাকাতিয়া অঞ্চলের ৩১,৯০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য সরকার একটা সমীক্ষা পরিচালনা করে। এ সমীক্ষার ভিত্তিতে ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউএনডিপি ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় খুলনা উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প (KCERP) গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের পরিধির মধ্যে ছিল ২৫, ২৭ ও ২৮ নম্বর পোল্ডার। সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার জন্যে সরকারীভাবে গৃহীত এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনগণ অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে সংগঠিত তীব্র গণ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৯০ সালে এই প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে।

বিল ডাকাতিয়া অঞ্চলের পানি নিষ্কাশনের জন্য কেজেডিআরপি প্রকল্পে নির্মিত শৈলমারী রেগুলেটরের সামনে সার্বক্ষণিকভাবে ড্রেজিং করার পরও ক্রমান্বয়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে নিষ্কাসন খাল

দ্বিতীয়তঃ পরবর্তীতে উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প-২ নামে (CERP-2) আর একটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য

সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের ভৌগলিক সীমানা হলো ২৪, ২৫, ২৭ ও ২৮ নম্বর পোল্ডার। মোট ৯০,০০০ হেক্টর এলাকার জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য এই প্রকল্প গ্রহন করা হয়। কিন্তু বাস্তবায়নের পূর্বেই সরকারের এ প্রকল্প পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়।

তৃতীয়ত: জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য সরকারী উদ্যোগের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হলো KJDRP। ১৯৯৩-৯৪ সালে জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য এবারও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় (৬ কোটি ২০ লাখ ডলার) খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (KJDRP) গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৬ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটি কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ও মৎস্য বিভাগের সহযোগিতায় সম্পাদনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল, জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খামার কেন্দ্রিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এলাকার দারিদ্র্য দূর করা। কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব ছিল প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে যশোর ও খুলনা জেলার ৮টি উপজেলার মোট ১ লক্ষ ৬০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূর হবে এবং প্রায় ৮ লক্ষ লোক এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবে।

চিত্র : ৬
কে জে ডি আর পি (KJDRP)
প্রকল্প এলাকা

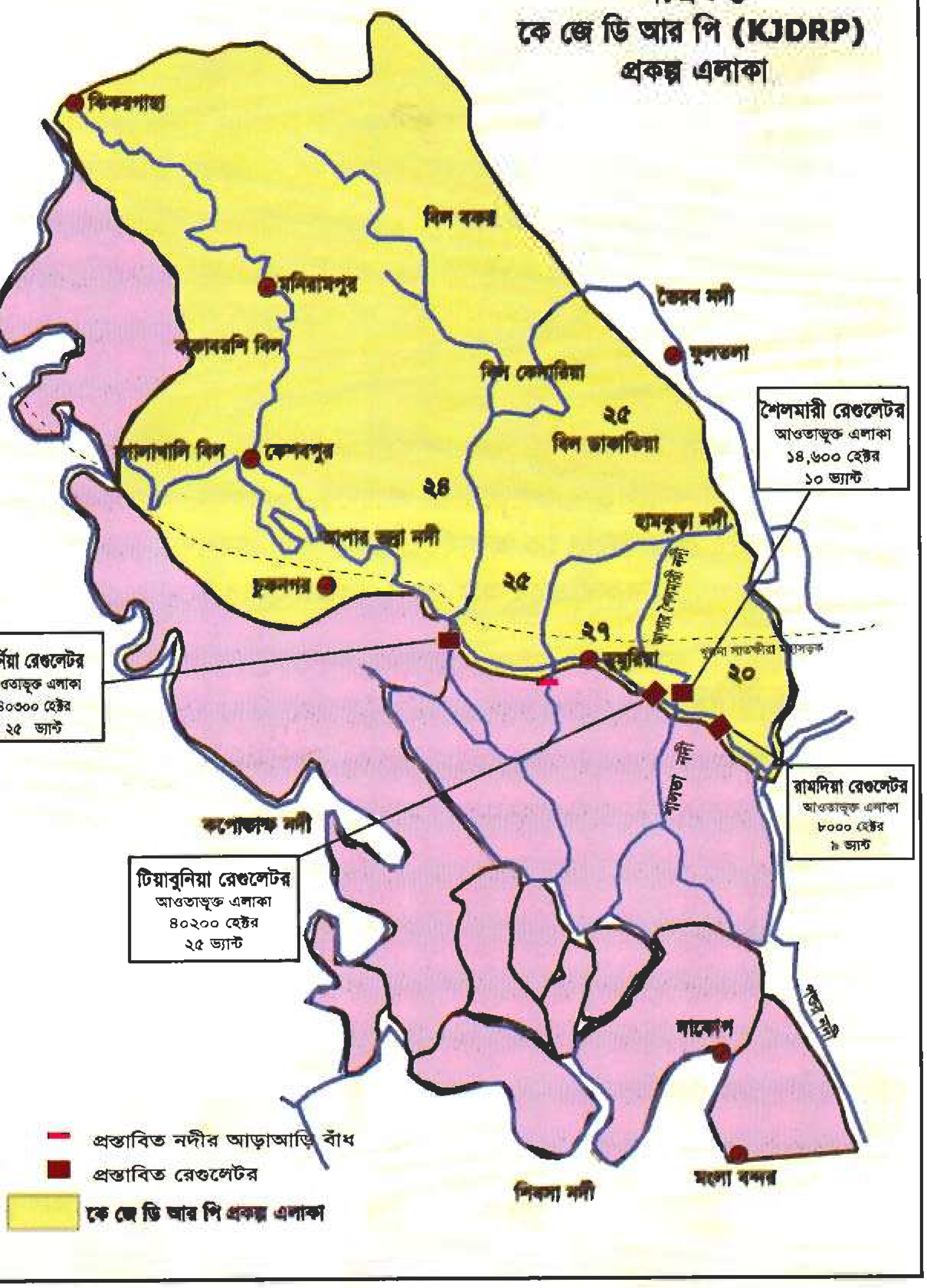

কিন্তু সমস্যার প্রকৌশলগত সমাধানের বিষয়ে জনগণের আপত্তি ছিল। অর্থাৎ জনগনের প্রস্তাবনা উপেক্ষা করে প্রকল্পে নুতন করে একাধিক নদীতে বাঁধ, ক্রসড্যাম, ভেড়ীবাঁধ, স্লুইসগেট ইত্যাদি নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। এ

অঞ্চলের জলাবদ্ধতা সমস্যা সৃষ্টির জন্য মূলতঃ পোল্ডার ব্যবস্থাই (প্রকৌশলগত অবকাঠামো) দায়ী। তাই পুনরায় অনুরূপ প্রকল্পের প্রস্তাবনা (KJDRP) জনগণের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং দ্রুত এ প্রকল্পের বিপক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। জনগণের দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার প্রকল্পটির সামাজিক ও পরিবেশিক প্রভাব যাচাই করে। পরবর্তীতে গবেষকরা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মৌলিক পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়। এ প্রস্তাবনা দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক সংযোজন। এতদিন ধরে পানি ব্যবস্থাপনার সকল সমস্যার প্রকৌশলগত সমাধান (Engineering solution) করা হয়েছে। নতুন প্রস্তাবনায় মূলত: জনগণেরই উদ্ভাবিত নতুন পন্থার নামকরণ করা হয় Tidal River Management (TRM)। দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বাঁধ, স্লুইসগেট, পোল্ডার ইত্যাদি নির্মাণ করে জলাবদ্ধতার কোন স্থায়ী সমাধান হবে না বরং তা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে এবং তুলবে। জনগণ তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে মনে করে জোয়ার বাহিত পলি নদীর বক্ষে অবক্ষেপন দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান সমস্যা। জোয়ার ভাটার প্লাবন-ভূমিতে জোয়ার বাহিত পলির অবক্ষেপনের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। সরকার বা পানি উন্নয়ন বোর্ড এই পদ্ধতিকে প্রথমতঃ নীতিগতভাবে গ্রহণ করলেও বাস্তবায়নে বা প্রয়োগে কোনরকম আন্তরিকতা প্রদর্শন করেনি। বরং বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল প্রয়োগ করে TRM কে অকার্যকর করার পন্থা অবলম্বন করেছে। উল্লেখ্য KJDRP এর পর জলাবদ্ধতা নিরসনে বর্তমান পর্যন্ত সরকারীভাবে আর কোন প্রকল্প গ্রহনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

৭. সরকারের নীতিমালা ও সীমাবদ্ধতা

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতা সমস্যার প্রকৃতি ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের উপায় নির্ধারণের লক্ষ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে সরকারের নীতি ও কৌশল কি এবং এই নীতি ও কৌশল দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতা ও বিরাজমান সমস্যা সমাধানে কতটুকু কার্যকর সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। জাতীয় পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা থাকলেও "জাতীয় পানি নীতি ও উপকূলীয় অঞ্চল নীতি-২০০৫" দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বিরাজমান সমস্যাবলী সমাধানে উল্লেখিত নীতিমালা দু'টি কতটুকু কার্যকর তার একটি বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

ক) উপকূলীয় অঞ্চল নীতি

ঈষৎ লবণপানি, জোয়ার-ভাটার গভীর খাড়ি, জালের মতন বিস্তৃত নদী, সুন্দরবন ও সামুদ্রিক জলজ প্রাণীর প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলকে অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। তাছাড়া মেঘনা মোহনায় অবক্ষেপিত পলির একটা বড় অংশ সামুদ্রিক জোয়ারের টানে খাড়ি নদী দিয়ে এ অঞ্চলে উঠে আসে। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প নির্মিত হবার পুর্বে এ পলি জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমিতে অবক্ষেপিত হত। বর্তমানে তা নদীর মৃত প্রান্তসীমায় অবক্ষেপিত হচ্ছে। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প নির্মিত হবার পূর্বে জোয়ার-ভাটা প্লাবনভূমিতে এ পলি অবক্ষেপিত হয়ে ভূমি গঠন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করত। এই অঞ্চলের গাছপালা, পশু-পাখি ও জলজ প্রাণী বাংলাদেশের অন্যান্য উপকূলীয় এলাকা থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। কিন্তু উপকূল অঞ্চল নীতিমালায় এ অঞ্চলের এই অনন্য ও স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করা হয়নি।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালার ৪.২ পানি

১. পানি অধ্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একাধিক উপধারা থাকলেও কোথাও জোয়ার বাহিত পলি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি। অথচ উপকূল অঞ্চলের প্রধান সমস্যা হল জোয়ার বাহিত পলির নদীতে অবেক্ষপন।

উপকূলীয় বাঁধের পূর্বে জোয়ার বাহিত পলি প্লাবনভূমিতে অবক্ষেপিত হত। কিন্তু পোল্ডার নির্মিত হওয়ার পর জোয়ার বাহিত পলি অধিক হারে নদীবক্ষেই অবক্ষেপিত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়ায় অনেক নদী ভরাট হয়ে গেছে। যার ফলে দেখা দিচ্ছে ভয়ঙ্কর জলাবদ্ধতা। কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালার ৪.২ ধারায় পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলা হলেও এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যা জোয়ার বাহিত পলি ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়নি।

২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কে এই নীতিমালায় কোন অনুচ্ছেদ রাখা হয়নি, তবে একাধিক উপধারায় (৪.৮.১.ক, ৪.৮.১. ঙ, ৪.৮.১.জ,) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন উপধারায় (৪.১.খ, ৪.৪.৪.ক) চিংড়ি চাষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিষয়টি স্ববিরোধী। চিংড়ি চাষ হলো একক চাষ পদ্ধতি (Mono culture) যা অন্যান্য প্রজাতির মাছের বিলুপ্তি ঘটায়। অন্যদিকে চিংড়ি চাষ করার কারণে বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। চিংড়ি চাষ অব্যাহত রেখে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বা জলাবদ্ধতা নিরসন কোনটাই সম্ভবপর নয়। তাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল এলাকার বিশেষ করে বৃহত্তর খুলনা জেলার কৃষি জমির প্রায় ৪২% ইতিমধ্যে চিংড়ি চাষের আওতায় চলে গেছে। চিংড়ি একটা পুঁজিঘন চাষ। এই পুঁজিঘন চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ পরিবার তাদের পূর্ববর্তী পেশা থেকে উচ্ছেদ হয়ে বেকারত্বের শিকার হয়েছে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারী ও শিশু, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক ও নিম্ন বর্ণের মানুষ।

৩. উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালার একাধিক ধারাতে (৪.১.খ, ৪.৪.৪.ক) চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ করার কথা বলা হলেও চিংড়ি চাষের মাধ্যমে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ লক্ষ লক্ষ মানুষের পুনর্বাসন ও জীবনমান উন্নয়নের কোন পদক্ষেপের কথা বলা হয়নি।

৪. নীতিমালায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় এবং তার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে তার সাময়িক নিরসনের লক্ষ্যে উপকূলীয় পোল্ডারকে আরও শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে (৮.৮.৩.গ)। অথচ পরিকল্পিতভাবে (টিআরএম পদ্ধতি) নদীর জোয়ার-ভাটা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পলি অবক্ষেপনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে উপকূল অঞ্চলের সকল জলাভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি করে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি স্থায়ীভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব। ইতিমধ্যে, এ অঞ্চলে বাস্তবায়িত "খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পুনর্বাসন (KJDRP) প্রকল্পে" TRM কে নীতিগতভাবে জলাবদ্ধতা ও নদী ভরাট সমস্যা সমাধানের একটি প্রধানতম কৌশল হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। অথচ প্রনীত নীতিমালায় বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

৫. নীতিমালার ৪.৮.১.খ উপধারায় সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া ৪.৮.১. খ উপধারায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সামর্থ্য, ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানো এবং পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন নীতির বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো তৈরী করা, উপধারা ৪.৮.১.ঘ এ কোস্ট গার্ডের ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি সুন্দরবনের প্রধান সমস্যা দুটি। (১) সুন্দরবন অঞ্চলে

মিষ্টিপানির প্রবাহ হ্রাস পাশাপাশি লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও (২) সুন্দরবনের ভিতরে অধিক হারে পলি অবক্ষেপন। সুন্দরবন বিশেষ করে সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে উজানের মিষ্টিপানির প্রবাহ হ্রাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও অধিক হারে পলি অবক্ষেপনের কারণে এ অংশে কম লবণসহনশীল গাছপালার পরিবর্তে অধিক লবণসহনশীল গাছ যেমন- কেওড়া, গেওয়া প্রভৃতি গাছের প্রসার ঘটছে এবং পূর্বাংশে মিষ্টি পানির প্রবাহ ঘাটতি হবার প্রেক্ষিতে কম লবন সহনশীল গাছ বিশেষকরে সুন্দরী গাছে আগামরা রোগ দেখা দিয়েছে। অধিক হারে পলি জমার কারণে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের বিভিন্ন গাছের শ্বাসমূল পলিমাটিতে আচ্ছাদিত হয়ে গাছের শ্বসন (Respiration) প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। ফলে গাছের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের প্রবৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে। অথচ প্রণীত উপকূল অঞ্চল নীতিতে সুন্দরবনের এই প্রধান দুটি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনার কথা বলা হয়নি।

খ) জাতীয় পানি নীতি

১. জাতীয় পানি নীতির অনুঃ ১. ভূমি' তে বলা হয়েছে "পানি সংক্রান্ত বহু সমস্যা ও অনিষ্পন্ন বিষয়াদি সমাধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এর মধ্যে সবচেয়ে সংকটপূর্ণ হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক বর্ষাকালে পানির আধিক্য ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি ও জনসংখ্যার কারণে পানির ঊর্ধ্বমুখি চাহিদা, নদ-নদীতে ব্যাপক পলিমাটি পড়ে ভরাট হওয়া এবং নদী ভাঙ্গন। লবণাক্ততা, ভূউপরোস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মানের ক্রমাবনতি ও পানি দূষণ সহ সামগ্রিক গুণগত মানের ব্যবস্থাপনা এবং ভৌত ও জৈব পরিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণের প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ...."এখানে পানি সম্পর্কিত সকল সমস্যা উল্লেখিত হলেও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সমস্যা জলাবদ্ধতা সমস্যাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

২. সমগ্র পানি নীতিমালার মধ্যে অনুঃ ৪.১২ (পরিবেশের জন্য পানি) তে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের পরিবেশ সমস্যাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে জলাবদ্ধতাকে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু সমগ্র পানি নীতিমালার মধ্যে এ জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা বলা হয়নি (জলাবদ্ধতার মূল কারণ নদী ভরাট হওয়া)। তবে জাতীয় পানি নীতিমালাতে বিভিন্ন স্থানে নদী ভরাট সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি নদী ভরাটের কারণ হিসেবে নদীতে অধিক হারে পলিমাটি অবক্ষেপনের বিষয়ও নীতিমালায় উল্লেখিত হয়েছে। নদী থেকে পলি অপসারণের কথাও বলা হয়েছে, (অনুঃ ৪.২.ঠ, অনুঃ ৪.১০.গ) কিন্তু কি ভাবে নদী ভরাট সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী ভাবে রোধ করা যাবে অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের বিভিন্ন নদীতে নিয়মিত জোয়ারের পানিতে আসা বিপুল পরিমান পলিমাটির ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, সে বিষয়ে কোন সু-নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা রাখা হয়নি।

৩. বর্তমান পৃথিবীর পানি বিশেষজ্ঞগণ আশংকা প্রকাশ করছেন পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এ অঞ্চল সমুদ্র পানিতে নিমজ্জিত হবে। অথচ পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলমগ্ন হবার সমস্যা স্থায়ী ভাবে মোকাবেলা করার বিষয় সম্পর্কে কোন কথা জাতীয় পানি নীতির মধ্যে সু-নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

৮. দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে করণীয়

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের সকল শ্রেনী-পেশার মানুষের একান্ত আকাংখা জলাবদ্ধতা সমস্যার দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হোক। কারণ ইতিমধ্যে জোয়ারবাহিত পলি নদীবক্ষে অবক্ষেপনের ফলে এ অঞ্চলে অসংখ্য

নদ-নদী ও নিষ্কাশন খালের অংশবিশেষ ভরাট হয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট অংশ ভরাট হওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এ অঞ্চলে জোয়ারের উচ্চতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার ফলে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি সহ প্রতিনিয়ত নতুন নানাবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে বসবাসরত ৫০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে জলাবদ্ধতার কারণে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এবং বাকীরাও ক্ষতির সম্মুখীন। এলাকাবাসীর ধারণা এ সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে অচিরেই সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়বে।

আমরা যদি ১৯৭৪ এবং ২০০১ সালের জনসংখ্যা জরিপের উপাত্তের একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব জাতীয় পর্যায়ে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৭ শতাংশ সেখানে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের অধিকাংশ উপজেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় বৃদ্ধির হারের অর্ধেকেরও কম। প্রকাশ থাকে যে, আশাশুনি উপজেলায় এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র ৩৮ শতাংশ। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই নিম্ন হার এ অঞ্চলের জনসাধারণের অধিক হারে বাস্তুচ্যুত হওয়াকেই নির্দেশ করে।

জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য পন্থা নিয়ে উত্তরণ মাঠ পর্যায়ে PRA, FFA, FGD, কর্মশালা, সেমিনার, গ্রুপ বৈঠক, মতবিনিময় সভা, জরিপ ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের অভিমত সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি এ অঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও অধিদপ্তরের অভিমতও উত্তরণ সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। প্রাপ্ত তথ্যাবলির ভিত্তিতে এ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য পন্থাগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

৮.১ টি আর এম (Tidal River Management)

উপকূলীয় বাঁধের নেতিবাচক প্রভাব এবং এর ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগ জনগণকে বিকল্প পন্থা উদ্ভাবনে বাধ্য করেছে যা জোয়ার ভাটা ব্যবস্থাপনা তথা TRM (Tidal River Management) হিসেবে পরিচিত। মূলত খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (KJDRP) বাস্তবায়নের সময় জনগণ জোয়ার ভাটা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের আন্দোলন গড়ে তোলে এবং এক পর্যায় জনগণ উপকূলীয় বাঁধ কেটে ভরত-ভায়না (কেশবপুর উপজেলায়) বিলে জোয়ার ভাটা চালুর মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। বাঁধ কাটার প্রেক্ষিতে খুব দ্রুত হরিনদীর গভীরতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় এবং একই ভাবে নদীটির প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে জোয়ার বাহিত পলি নদীতে অবক্ষেপিত না হয়ে বিলের অভ্যন্তরের প্লাবনভূমিতে অবক্ষেপিত হতে থাকে। এ ভাবে বিলের অভ্যন্তরের ভূমি গঠন প্রক্রিয়া চালু করা সম্ভব হয় এবং বিলটি একটি জোয়ারাধারে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় ভায়না বিলের গড় উচ্চতা ৫.৫ ফুট বৃদ্ধি পায় ও জলাবদ্ধতা নিরসন হয়। এ ব্যবস্থাটিই পরবর্তীকালে TRM (Tidal River Management) নামে খ্যাত হয়।

ভবদহ স্লুইসগেটের মাধ্যমে বিল কেদারিয়ায় টিআরএম বাস্তবায়ন করার কারণে পলিতে ভরাট হরি নদী সংশ্লিষ্ট স্লুইসগেট

জনগণ মূলতঃ এ বিকল্প ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবক এবং এ ব্যবস্থাপনা তাদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতারই ফসল। এক কথায় বলা যায় যে, জনগণের প্রস্তাবনা হলো নদীতে জোয়ার-ভাটা অব্যাহত রেখে জোয়ার-বাহিত পলি বিকল্প স্থানে (জলমগ্ন বিলে) অবক্ষেপনের ব্যবস্থা করা। এ পদ্ধতিতে নদীর প্লাবনএলাকা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে নদীর পানি প্রবাহ ও স্রোতের তীব্রতা বহুগুন বৃদ্ধি পায়। ফলে একদিকে এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা যেমন বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে তেমনই ভূমির নিম্নগমন রোধ করে ভূমি উদ্ধার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এর পাশা-পাশি জীববৈচিত্র্যও সংরক্ষিত হয়। ভরতভায়না বিল থেকে এ ধারণা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া KJDRP এর বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের এক পর্যায় সরকার সি ই জি আই এস (CEGIS) কে দিয়ে জনগণের প্রস্তাবের উপর সমীক্ষা পরিচালনা করে। এই সমীক্ষায় জনগণের প্রস্তাবিত TRM ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয় "TRM ব্যবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক, পরিবেশ বান্ধব, প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বাস্তবায়নযোগ্য এবং জনগণের কাছে অতিমাত্রায় গ্রহণযোগ্য" (Invironmental Management plan for the khulna Jessore drainage Rehabilitation project, Invironment and EGIS support project for water sector planing-1999)| সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের বৈরী প্রভাবের বিষয়ে জনগণের এক ধরনের ঐক্যমত গড়ে উঠেছে। জনগণ মনে করে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পই নদী ভরাট, জলাবদ্ধতা, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, অধিকহারে ভূমির নিম্নগমনসহ সকল ধরণের পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। তাদের মতে TRM-ই হতে পারে এ সকল সমস্যা সমাধানের প্রধানতম উপযোগী পদ্ধতি। তবে TRM ব্যবস্থা বাস্তবায়নে জনগণের আকাঙ্খা ব্যর্থ করার নানাবিধ অপকৌশলও ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন ঃ

১) TRM ব্যবস্থার জন্য ব্যবহৃত জমির ক্ষতিপূরণ না দেওয়া।

২) TRM বাস্তবায়নের জন্য স্থান হিসেবে এমন সব বিল নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে TRM একটি অকার্যকর পদ্ধতি বলে প্রমাণ করা সহজ হবে। যেমন-কেজেডিআরপি প্রকল্পে টিআরএম বস্তিবায়নের জন্য নির্ধারিত বিল কেদারিয়া। বিলটি শ্রী নদীতে অবস্থিত ভবদহ রেগুলেটর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, যেখানে বর্তমান অবস্থায় জোয়ারভাটা সম্পূর্ণভাবে চালু রাখা সম্ভব নয়।

৩) জনগণের দাবী অনুযায়ী পোল্ডার কেটে বিলের মধ্যে সরাসরি জোয়ার-ভাটা প্রবাহিত না করে স্লুইসগেটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা।

প্রকাশ থাকে যে, চলতি ২০০৫ সালের জুলাই মাসে ভবদহ স্লুইসগেটের পিছনে পলি জমে বেশকিছুদুর শ্রীনদী সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে গেছে। যে কারণে কেদারিয়া টাইডাল বেসিনে এখন আর জোয়ারের পানি যেতে পারছে না। ইতিমধ্যে মনিরামপুর ও অভয়নগর উপজেলার ভবদহ স্লুইসগেট সংশ্লিষ্ট এলাকায় জলাবদ্ধতা বেড়েছে। জনগণ পুনরায় জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলেছে এবং জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবীতে ইতিমধ্যে যশোর জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেছে। ভবদহ স্লুইসগেটের ভিতর দিয়ে টিআরএম বাস্তবায়নের বিষয়ে জনগণের প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল। জনগণ আশংকা প্রকাশ করেছিল ভবদহ স্লুইসগেটের ভিতর দিয়ে টিআরএম বাস্তবায়ন করলে কেদারিয় বিলে আশানুরূপ পলি পৌছাবে না এবং পলি জমে শ্রীনদী ভরাট হবে। বর্তমানে ভবদহ স্লুইসগেটের পিছনে পলি জমা ও শ্রীনদী ভরাট হওয়াতে এলাকার জনগণের ধারণা বা আশংকাই মূলতঃ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

৮.২ উজান নদীর সংগে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জোয়ার-ভাটার খাড়ি নদীর পুনঃসংযোগ

মধ্যবঙ্গ তথা বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, নদীয়া ও ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশে এক সময় উজান প্রবাহের

প্রধান উৎস ছিল মাথাভাঙ্গা ও তার শাখা নদীসমূহ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাথাভাঙ্গা নদীর উৎস মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে পদ্মা থেকে এ অঞ্চলের নদীসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে মাথাভাঙ্গা নদী ও তার শাখা নদী থেকে উৎপত্তি সকল নদীর নিম্নাংশ জোয়ার-ভাটার নদীতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে এই সকল নদীর অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠে। জোয়ারবাহিত পলি এ সমস্ত নদীর মৃত প্রান্ত সীমায় অধিক হারে অবক্ষেপিত হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। প্রকাশ থাকে যে, বেত্রাবতী, কপোতাক্ষ, ভদ্রা, হরিনদী, শ্রীনদী, মুক্তেশ্বরী, ভৈরব, চিত্রা, নবগঙ্গা-সবই প্রায় মাথাভাঙ্গা ও তার শাখা নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করে। উল্লেখিত প্রায় প্রতিটি নদীর(বিশেষ করে কপোতাক্ষ, বেতনা, ভদ্রা, শ্রীনদী, হরি নদী, হামকুড়া, শৈলমারী, বুড়িভদ্রা প্রভৃতি) অববাহিকায় বর্তমানে ব্যাপক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এ দিকে গড়াই নদীর উৎসমুখে পলি ও বালি জমার কারণে শুষ্ক মৌসুমে গড়াই নদীর প্রবাহ কয়েক বছর ধরে পদ্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কয়েক বছর আগে গড়াইয়ের উৎস মুখ খননের উদ্যোগ নেওয়া হয়, কিন্তু তা কোন্ এক অদৃশ্য কারণে সফলভাবে সমাপ্ত হয়নি।

মাথাভাঙ্গা অববাহিকায় উজানের প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য তৎকালীন বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত বিখ্যাত পানি বিজ্ঞানী উইলিয়াম কক্স (১৯১৯ সালে) মাথাভাঙ্গার নিম্নে পদ্মা নদীতে বাঁধ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাবের অন্যতম দিক ছিল, বাঁধের মাধ্যমে গঙ্গানদীর পানির উচ্চতা ৭ ফুট বৃদ্ধি করে মাথাভাঙ্গাকে পুনর্জীবিত করা। তবে এ প্রকল্প উপনিবেশিক সরকারের আগ্রহের অভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বেশ কয়েক বছর ধরে পদ্মা নদীতে ব্যারাজ দিয়ে গড়াই সহ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে নদী সমূহে উজান প্রবাহ বৃদ্ধির প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে। তবে তা কার্যকর করার মত বাস্তব উদ্যোগ এখনও পরিলক্ষিত হয়নি। যদি এ অঞ্চলের নদী সমূহের সাথে পদ্মা নদীর পুনঃসংযোগ স্থাপন করা যেত তাহলে ভাটার সময় নদীর স্রোতের তীব্রতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেত এবং জোয়ার বাহিত পলি ভাটার প্রবল টানে নদী থেকে অপসারিত হত এবং জলাবদ্ধতা কমে যেত। একই সাথে ভূমি গঠন-প্রক্রিয়া সক্রিয় হতো। তাই যত ব্যয়বহুল হোক না কেন দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সমস্যা দূর, সুন্দরবনও অন্যান্য এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা ও সকল পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করার জন্য পদ্মা নদীর সঙ্গে এ অঞ্চলের নদীগুলোর পুনঃসংযোগ স্থাপন খুবই জরুরী। এ অঞ্চলের জনগণের এটা একটা ন্যায্য দাবী।

তবে এ কথা সত্য যে, গড়াই অববাহিকা অপেক্ষা মাথাভাঙ্গা অববাহিকায় উজান প্রবাহ বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। কারণ জলাবদ্ধতা ও পরিবেশ বিপর্যয় এখন মাথাভাঙ্গা অববাহিকাতেই সর্বাধিক তীব্র । তাই মাথাভাঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

৮.৩ নদীসমূহের মধ্যে আন্তঃ সংযোগ স্থাপন

যশোরের নিম্নাংশ ও বৃহত্তর খুলনার উপকূলীয় জলাভূমি অসংখ্য নদী ও খালের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ খাল ও নদীগুলো জলাভূমির মধ্যে জালের মত বিস্তার করে আছে। উপকূলীয় বাঁধের পূর্বে এ খাল ও নদীগুলোর মধ্যে এক ধরণের আন্তঃ সংযোগ ছিল। যার প্রেক্ষিতে জোয়ারের চাপ ও ভাটার তীব্রতাও বেশী ছিল। কিন্তু উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অসংখ্য নদী ও খালকে আড়া আড়ি বাঁধ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে একদিকে যেমন জোয়ারের চাপ কমে যায়, অন্যদিকে তেমনি ভাটার তীব্রতাও হ্রাস পায়। উপকূলীয় এলাকার অভিজ্ঞ অধিবাসীগণ মনে করেন যদি পুনরায় এ সকল খাল ও নদীগুলোর মধ্যে আন্তঃ সংযোগ করা হয়, তাহলে পুনরায় জোয়ারের চাপ ও ভাটার তীব্রতাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে নদীতে পলি অবক্ষেপনের পরিমানও কমে আসবে এবং বিভিন্ন বিকল্প পথে স্থানীয়ভাবে জলাবদ্ধতা হ্রাস করা সম্ভব হবে। এতে জলজ প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সহজসাধ্য হবে, ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ এবং পানির বহুমুখী ব্যবহারও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৮.৪ ভূ-গঠন অনুযায়ী নিষ্কাশন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস

নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভূ-গঠন অনুযায়ী বিন্যস্ত না হওয়া অনেক ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ । এলাকার নদীগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের পর ভূমির ঢাল (Slope) অনুযায়ী নিষ্কাশন অবকাঠামো পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি, পীট এলাকা এবং অন্যান্য এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে পোল্ডারের পুনর্বিন্যাস হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৮.৫ অবকাঠামোর পুনর্বিন্যাস

পোল্ডারের অভ্যন্তর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়ার জন্য স্লুইসগেটগুলো নির্মাণ করা হয়। ভিতরে বাইরে পলি জমার কারণে এ সকল স্লুইসগেট দিয়ে প্রয়োজনে পোল্ডার অভ্যন্তরে ইচ্ছা মত পানি উঠানো-নামানো আজ আর সম্ভব নয়। তাছাড়া স্থানীয় জনগণ মনে করে গেটের সংখ্যা ও পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় কম। গেটগুলোর পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা যাতে পর্যাপ্ত হয় এবং পলি জমে নিষ্কাশন ব্যবস্থা অকার্যকর না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কখনও নতুন স্লুইসগেট স্থাপনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে বিলের তলদেশ এবং ভূমির নিম্নগমনের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।

৮.৬ অপরিকল্পিত কার্যক্রম বন্ধ করা

অপরিকল্পিত রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, চিংড়িচাষ, নিষ্কাশন খালে অবৈধ দখল, খালে কচুরিপানা আগাছার প্রাদুর্ভাব, নদী ও খালে মাছ ধরার বিভিন্ন সরঞ্জামাদি স্থাপন ও অবৈধ স্থাপনা প্রভৃতি কারণে জলাবদ্ধতা ও বন্যা সমস্যা দিন দিন তীব্র হচ্ছে। যদি নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে এসব অপরিকল্পিত কাজগুলো থেকে বিরত থেকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাহলে জলাবদ্ধতাসহ বন্যা সমস্যা থেকে এলাকাকে কিছুটা মুক্ত করা সম্ভব হবে।

অনেক সময় দেখা যায় নদী খনন বা ড্রেজিং করার পরও পরিস্থিতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আরো ভয়াবহ হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এমন জায়গায় স্লুইসগেট বা পাইপ স্থাপন করা হয় যেখান থেকে পানি তেমন নিষ্কাশিত হয় না, বরং জলাবদ্ধতা আরো প্রসারিত করে। এসব বিষয়গুলোর প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ নজর দেওয়া উচিৎ।

৮.৭ ভূমি ব্যবহার নীতিমালা

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় ৪২ শতাংশ জমিতে বর্তমানে চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। চিংড়ি চাষকৃত এলাকাতে ঘের মালিকরা প্রয়োজনে ঘের অভ্যন্তরে নিষ্কাশন খাল, স্লুইস গেট, খাস জমি ও উপকূলীয় বাঁধ অবৈধ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আবার কখনও কখনও নিষ্কাশন খালগুলো সরকারের পক্ষ থেকে ইজারা দেয়া হয় এবং ইজারা গ্রহীতাগণ খালগুলোতে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে, যে কারণে প্রায়ই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তাই দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার ভূমিহীন ক্ষুদ্র চাষীসহ সকলের জীবনযাত্রা সুষ্ঠু রাখার জন্য একটি কার্যকর ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রয়োজন। যার প্রেক্ষিতে জলাবদ্ধতা ও লবণপানির চিংড়ি চাষের এলাকার অন্যান্য দুর্ভোগ কমানো সম্ভব হবে।

৯. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নদ-নদীর প্রবাহ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা সমূহের পর্যালোচনা

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মিষ্টিপানির প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঙ্গা/পদ্মা

নদীর উপর ব্যারাজ নির্মাণ করে বিভিন্ন সংযোগ খালের মাধ্যমে পানি প্রবাহের কথা বলা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ নৌ যোগাযোগ বৃদ্ধি, উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা ছিল এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। ব্যারাজ নির্মাণের বিভিন্ন প্রস্তাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলেও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় কোন্ প্রস্তাব গ্রহন করা হবে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। অন্যদিকে সুস্পষ্টভাবে নদীভরাট, পলি সমস্যা ও জলাবদ্ধতা সমস্যা বিষয়টিও জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় আসেনি। শুধুমাত্র বলা হয়েছে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জলাবদ্ধতা ও নদী ভরাট সমস্যার উন্নতি হবে। বাস্তবে জলাবদ্ধতা ও নদী ভরাট সমস্যার কতটা উন্নতি হবে সে বিষয়ে নিম্নে আলোচনার অবতারণা করা হলোঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম এবং দক্ষিণ মধ্য অঞ্চল এর পানি সম্পদভিত্তিক মানচিত্র

চিত্র : ৭

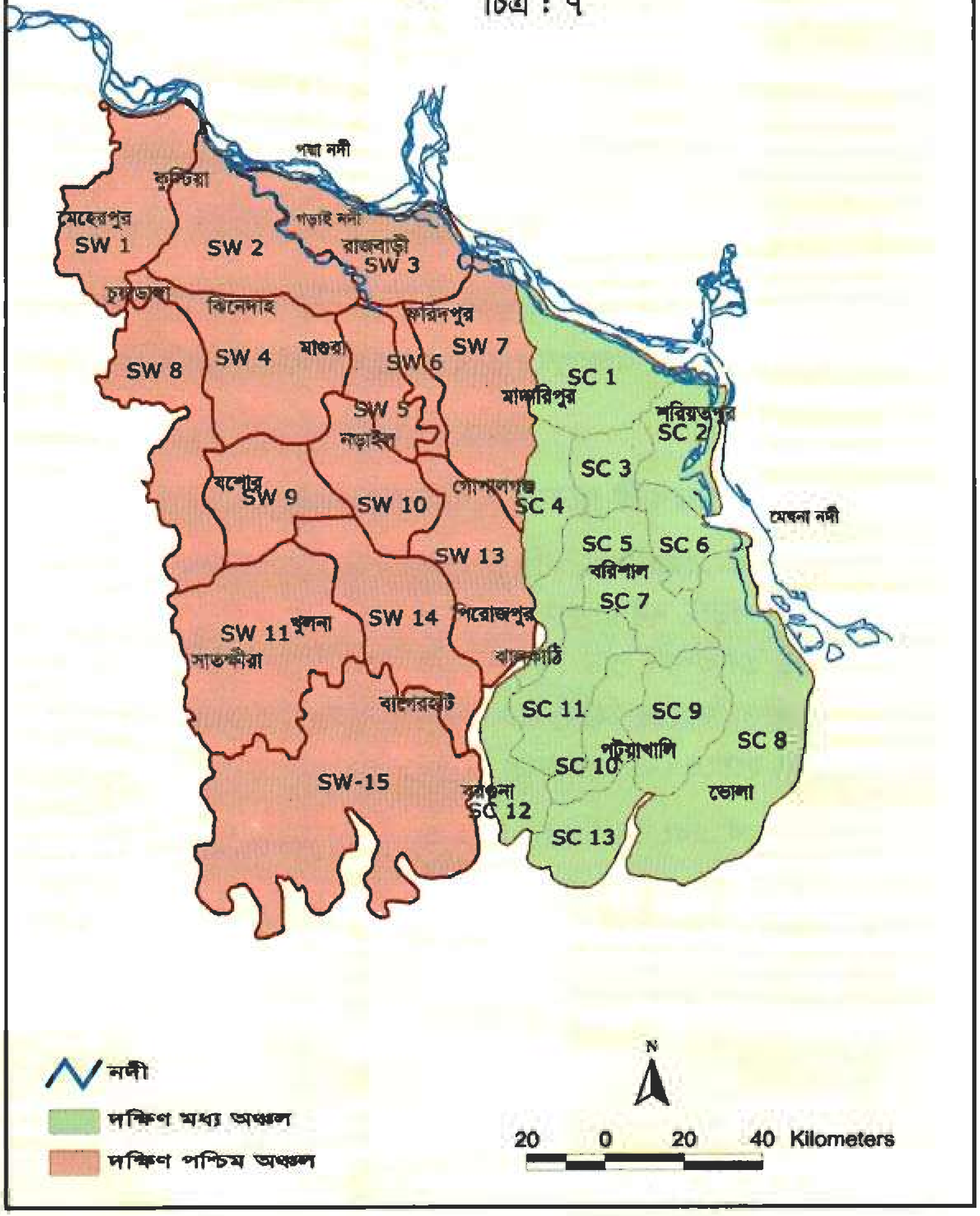

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিপর্যস্ত পরিবেশের উন্নয়নের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় হতে এলাকার নদ-নদী গুলোর প্রবাহ বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এলাকার মৃত বা মৃতপ্রায় নদ-নদীগুলোকে যদি প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে উজ্জীবিত করা সম্ভব হয় তাহলে যেমন নদ-নদীগুলো তার পুনর্জীবন ফিরে পাবে তেমনি লবণাক্ততার তীব্রতাও প্রশমিত হবে। উন্নতি ঘটবে কৃষি নির্ভর অর্থনীতির, নিরসন হবে নদী ভরাটজনিত জলাবদ্ধতার। সকলে এ বিষয়ে একমত যে, উজানের প্রবাহ হ্রাস হওয়াতে লবণাক্ততার পরিমান বৃদ্ধি এবং অধিক হারে পলি অবক্ষেপন সুন্দরবনেরও সার্বিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পুরাতন গাঙ্গেয় প্লাবন ভূমি ও উপকূলীয় প্লাবনভূমির মধ্যবর্তী অংশের ব্যাপক এলাকা বর্তমানে জলাবদ্ধ।

ইতিমধ্যে সরকার বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য "জাতীয় পানি নীতি" ও "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" তৈরী ও অনুমোদন করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনাও তৈরী করা হয়েছে। এ সকল পরিকল্পনায় দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নদ-নদীর প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য যে সকল প্রস্তাবনা করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

- পদ্মা বাঁধ নির্মাণ না করে গড়াই নদীর কামারখালী পয়েন্টে বাঁধ/ব্যারাজ নির্মাণ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করা (ফ্যাপ-৪, ১৯৯৩)।
- পদ্মা নদীতে বাঁধ/ব্যারাজ নির্মাণ করে গড়াই ও মাথাভাঙ্গার শাখা নদীগুলোর প্রবাহ বৃদ্ধি করা (ফ্যাপ-৪, ১৯৯৩; এন ডব্লিউ এম পি, ২০০২) এবং
- পদ্মা নদীর মাওয়া ও পাকশী পয়েন্টে বাঁধ/ব্যারাজ নির্মাণ এবং পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলন করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলের পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করা (কলম্বি, ২০০১)।

৯.১. গড়াই নদীর কামারখালী পয়েন্টে বাঁধ/ব্যারাজ নির্মাণ

বিভিন্ন সময়ে পানি বিজ্ঞানীগণ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষকরে মাথা ভাঙ্গা নদীর অববাহিকায় মৃত নদীগুলোর পুনর্জীবনের জন্য গড়াই নদীর কামারখালী পয়েন্টে বাঁধ এবং লিংক ক্যানেল নির্মাণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। পানি বিজ্ঞানীগণ ফ্লাড এ্যাকশান প্লান (ফ্যাপ) এর রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে এ প্রস্তাবনা উপস্থাপন ও তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তা ছাড়া খরচের বিবেচনায় প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম অর্থের প্রয়োজন পড়বে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রস্তাবনার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ (চিত্র ৮)

- গড়াই নদীর মুখ এবং উৎপত্তিস্থল হতে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ বরাবর ড্রেজিং করে গড়াই নদীকে নাব্য রাখা।
- কামারখালী পয়েন্টে গড়াই নদীর উপর বাঁধ/ব্যারাজ নির্মাণ করা।
- কামারখালী বাঁধে সঞ্চিত পানি সংযোগ খালের (৬ নং) মাধ্যমে মধুমতি নদীর পূর্বদিকে এবং সংযোগ খালের (৭ ও ৮ নং) মাধ্যমে পশ্চিমের নদী গুলোতে প্রবাহিত করা।

প্রস্তাবিত এ প্রকল্প থেকে প্রকল্প প্রণেতা বিশেষজ্ঞগণ যে সকল সুবিধা পাওয়া যাবে বলে প্রত্যাশা করেছেন তা নিম্নরূপঃ

- লিংক ক্যানেলের (৭ ও ৮ নং) মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মাথাভাঙ্গার অববাহিকায় মৃত এবং মৃতপ্রায় নদ নদীতে মিষ্টিপানির প্রবাহ বৃদ্ধিকরা সম্ভব হবে।
- মাথাভাঙ্গা এবং গড়াই নদীর নিম্ন অববাহিকায় লবণাক্ততা হ্রাস পাবে এবং নদীতে অবক্ষেপিত জোয়ার বাহিত পলি ভাটার টানে অপসারিত হবে।
- দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভূ-উপরোস্থ পানি দ্বারা সেচ সুবিধা ঘটানো যাবে।
- সুন্দরবন এলাকায় লবণাক্ততা হ্রাস পাবে এবং গাছের মড়কসহ লবণাক্ততা জনিত কারণে সৃষ্ট সমস্যা নিরসন হবে।
- দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নদীর অববাহিকায় মিষ্টিপানি নির্ভর জলজ প্রাণী ও জীব বৈচিত্র্যের উন্নয়ন ঘটবে।

চিত্র : ৮ পদ্মা ব্যারেজ ছাড়া প্রবাহ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা

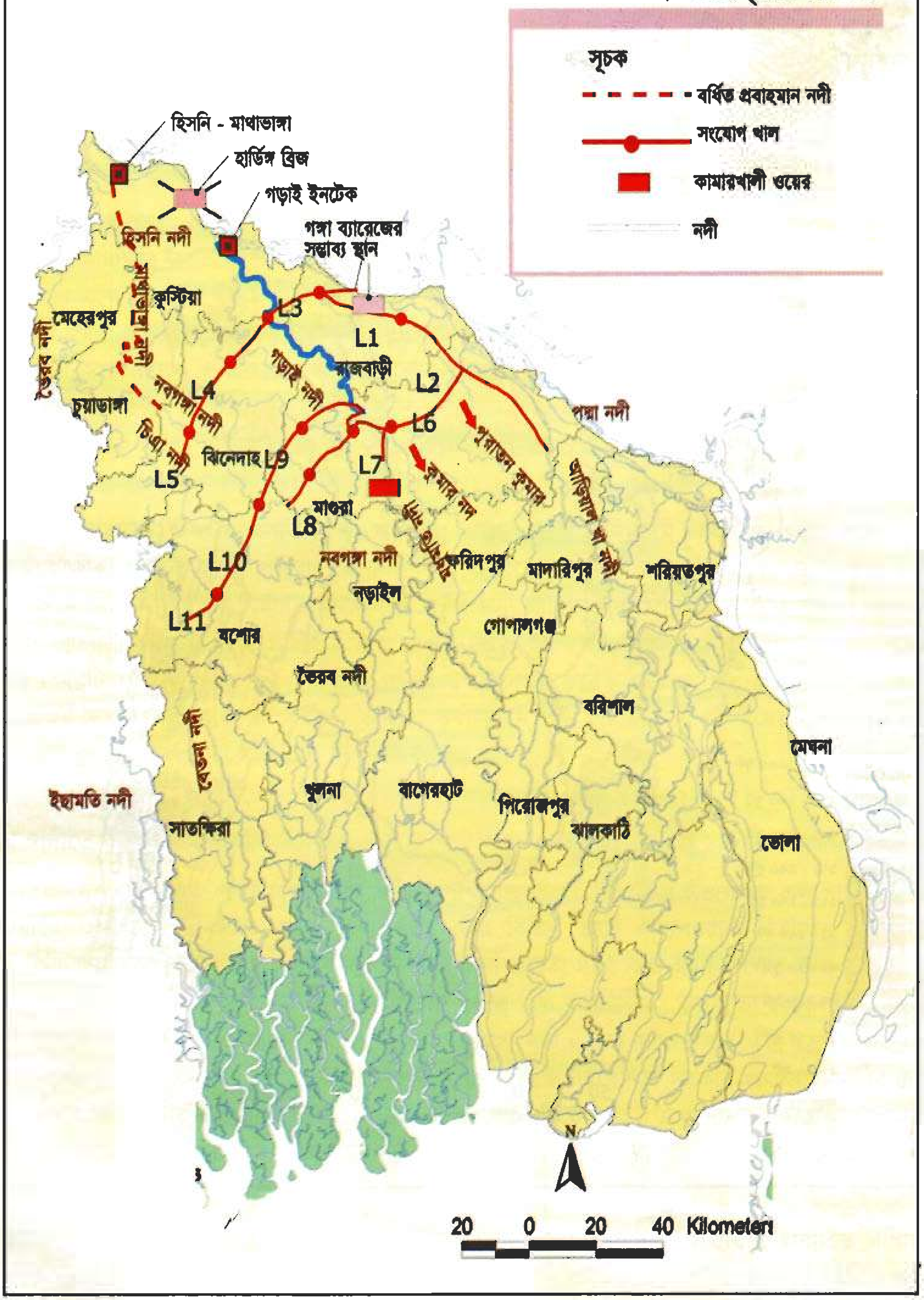

চিত্র : ৯
সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ভূমি উচ্চতার মানচিত্র

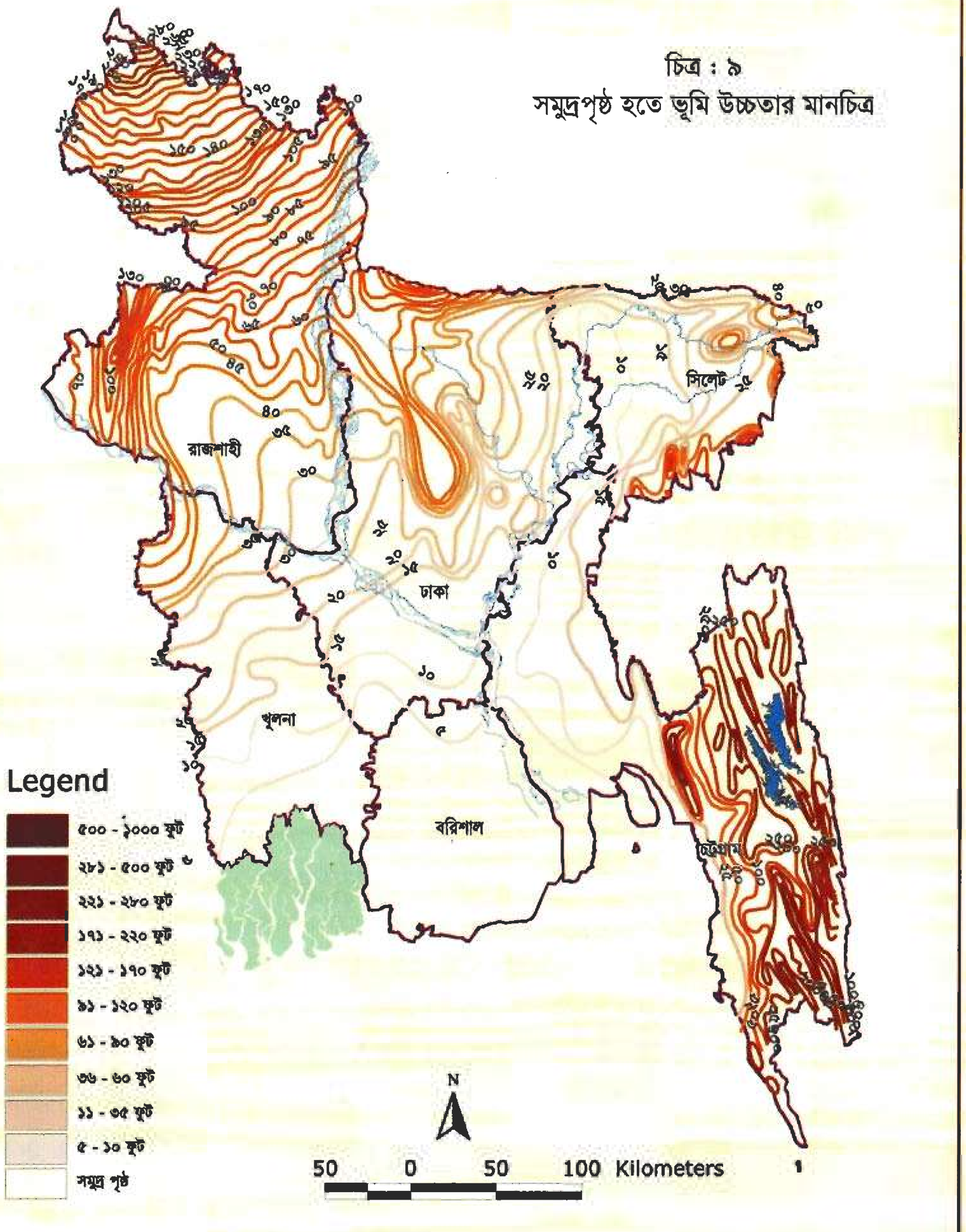

- নৌপথের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে।
- ভূ-গর্ভস্থ মিষ্টিপানির পরিমান বৃদ্ধি পাবে।

মিষ্টিপানির স্বল্পতা বা মাথাভাঙ্গা নদীর প্রবাহ বন্ধ হওয়ার কারণে যে সকল এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সে সকল এলাকা (বেত্রাবতী, কপোতাক্ষ, নবগঙ্গা, ভৈরব, ভদ্রা প্রভৃতি নদীর অববাহিকায়) প্রস্তাবিত প্রকল্প দ্বারা কতটুকু উপকৃত হবে তার পর্যালোচনা প্রয়োজন। প্রকল্পপ্রণেতা বিশেষজ্ঞগণের প্রত্যাশিত ফলাফল বাস্তবে অর্জিত হবে কিনা নিম্নে সে বিষয়ে আলোচনা করা হলোঃ

- দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের ভূমি গঠনের ঢাল উত্তর-পশ্চিম হতে দক্ষিণ-পূর্বমুখি। কিন্তু প্রস্তাবিত প্রকল্পে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সকল সংযোগ খালগুলো দক্ষিণ-পশ্চিম মুখী করে খনন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সংযোগ খালগুলোর প্রাকৃতিক ঢাল যথেষ্ট না হওয়ায় এসব খাল দিয়ে পানি পর্যাপ্ত বেগে প্রবাহিত হবেনা। ফলে একদিকে খাল দ্রুত পলি জমে ভরাট হবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকবে, অন্যদিকে জলাবদ্ধতা নিরসন ও এলাকার ভরাট নদীর পলি অপসারণেও এ প্রকল্পের খালগুলি কোন ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারবে না। তাই মিষ্টিপানির প্রবাহ বিহীন এলাকা তথা মাথাভাঙ্গা অববাহিকার কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর, মাগুরা ও নড়াইলের বৃহত্তর অংশ, সাতক্ষীরা ও খুলনা অঞ্চলসমূহ (SW ১,২,৪,৫,১০,১১,১২) এ প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ (চিত্র ৯)।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ঘনবসতিপূর্ণ এ অঞ্চলের ব্যাপক উর্বর কৃষি জমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হবে। কয়েক হাজার প্রান্তিক চাষী পরিবার জীবনজীবিকা হারাবে, অনেকে বাস্তুচ্যুত হবে। তাই প্রয়োজন হবে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য আবাসস্থান নির্মাণ, পুনর্বাসন ও এদের জন্য জীবিকা পুর্নগঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার। প্রকল্পের প্রত্যাশা অনুযায়ী পানি প্রাপ্তির বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। কারণ শুষ্ক মৌসুমে গড়াই মুখে পর্যাপ্ত পানি প্রাপ্তির বিষয়টি ফারাক্কা ব্যারেজ থেকে প্রাপ্ত পানির উপর নির্ভর করে। বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কা পয়েন্টে পানি প্রবাহ মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া পর্যায়ক্রমে পলি জমার ফলে গড়াইয়ের নাব্যতা রক্ষা করাও একটা বড় ধরণের সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা যায়।

৯.২ পদ্মা নদীতে বাঁধ/ব্যারাজ নির্মাণ

বিভিন্ন সময়ে দেশ বিদেশের পানিবিশেষজ্ঞগণ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মিষ্টিপানির অভাবগ্রস্থ এলাকায় পদ্মার শাখা নদীর মাধ্যমে পানি প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য পদ্মা নদীর বিভিন্ন স্থানে বাঁধ/ব্যারাজ নির্মাণের প্রস্তাবনা পেশ করেছেন। ব্রিটিশ আমলেও মাথাভাঙ্গা নদীকে পুনর্জীবনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। বাংলায় রেলওয়ে যোগাযোগ স্থাপনের পূর্বে পরিবহন বা যোগাযোগের জন্য নৌ-পথের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কলকাতা থেকে উত্তর বাংলায় বা উত্তর-পূর্ব ভারতে যাতায়াতের একমাত্র নৌ-পথ ছিল মাথাভাঙ্গা নদী। কিন্তু মাথাভাঙ্গার তীব্র স্রোত প্রায়শ বিভিন্ন ধরণের নৌ-দুর্ঘটনার সৃষ্টি করতো, যাতে বেশ প্রাণহানীও ঘটতো। উপনিবেশিক সরকার মাথাভাঙ্গা নদীর এই তীব্র স্রোত হ্রাস করার জন্য নদীর উৎসমুখে মাটি ভর্তি বড় বড় নৌকা ডুবিয়ে দেয়। ফলে সাময়িকভাবে মাথাভাঙ্গার তীব্র স্রোত হ্রাস পায় বটে কিন্তু পরিণতিতে ধীরে ধীরে নদীর উৎসমুখে স্থায়ীভাবে চরা পড়ে যায় এবং মাথাভাঙ্গা নদী পদ্মা নদী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার উত্তর-পূর্ব ভারত এবং উত্তর বাংলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য মাথাভাঙ্গাকে পুনর্জীবিত করার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। যার কোনটাই শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। অবশেষে

১৯১৯ সালে বিশ্ববিখ্যাত পানিবিজ্ঞানী উইলিয়াম কক্স মাথাভাঙ্গা নদীর নিম্নাংশে গঙ্গা নদীতে বাঁধ দিয়ে বাঁধের উপরের অংশে গঙ্গার পানির উচ্চতা ৭ ফুট বৃদ্ধির পরিকল্পনা পেশ করেন। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে মাথাভাঙ্গা নদী পুনর্জীবিত হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেনি। কারণ, ইতিমধ্যে যোগাযোগের বাহন হিসেবে রেলওয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব লাভ করে। একইসাথে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবার ফলে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মাথাভাঙ্গা নদীর গুরুত্বও হ্রাস পায়। তবে একথা সত্য মাথাভাঙ্গা নদী বিভাগপূর্ব বাংলার নিম্ন-মধ্য অংশ এবং বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পানি সম্পদ ও কৃষি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাথাভাঙ্গা নদীর এই অপমৃত্যুর ফলে একদিকে যেমন নিম্ন-মধ্যবঙ্গে ভূমিগঠন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় তেমনি বৃহত্তর খুলনা ও যশোরের নিম্নাংশে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়।

এদিকে গঙ্গায় বাঁধ দিয়ে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা সাময়িকভাবে স্থগিত হলেও ভারত সরকার পঞ্চাশের দশকে মাথাভাঙ্গার উপরে ফারাক্কা পয়েন্টে গঙ্গা নদীতে বাঁধ/ব্যারাজ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ বাঁধের প্রস্তাব গ্রহণ করার পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা করার জন্য হুগলী নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা। উল্লেখ্য, এর পূর্বেই ভারত সরকার দামোদর নদীতে বাঁধ দিয়ে প্রায় ৪০ হাজার কিউসেক পানি প্রত্যাহার করে নেয়। সেকারণে হুগলী নদীতে মারাত্মকভাবে পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় পলি অবক্ষেপিত হয়ে ক্রমান্বয়ে এ নদীর নাব্যতা হ্রাস পেতে থাকে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিকল্প প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফারাক্কা বাঁধের প্রস্তাবনা করা হয় এবং এ প্রস্তাবে গঙ্গা থেকে সংযোগ খালের মাধ্যমে ৪০ হাজার কিউসেক পানি প্রত্যাহার করে ভাগিরথী নদীর মধ্য দিয়ে হুগলী নদীতে প্রবাহিত করার প্রস্তাব করা হয়।

ভারত সরকার গঙ্গা বাঁধের প্রস্তাব গ্রহণ করায় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার বা পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারও বাংলাদেশে পদ্মা নদীতে ফারাক্কার অনুরূপ আর একটা বাঁধ দেয়ার কথা বলতে থাকে। রাজনৈতিক নেতাদের মুখ থেকে বারবার এ প্রস্তাবনার কথা উচ্চারিত হবার ফলে বিষয়টি জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে গড়াই এর উৎসমুখে পলি ভরাট হয়ে গড়াই শুষ্ক মৌসুমে তার নাব্যতা হারিয়ে ফেললে পদ্মা বাঁধের ধারণাটি বাস্তবে প্রয়োগ করার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ফারাক্কা বাঁধের ফলে ভাটিতে সৃষ্ট সমস্যাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ের একটি সমাধান পদ্মা নদীতে বাঁধ দিয়ে পাওয়া সম্ভব। প্রাথমিকভাবে পদ্মা মূলত ২টি লক্ষ্যকে -সামনে রেখে বিশেষজ্ঞগণ পদ্মা নদীতে ব্যারাজ নির্মাণের প্রস্তাব করেণ। লক্ষ্য ২টি হল

১) পদ্মা নদীর উপরে বাঁধ/ব্যারাজ নির্মাণ করে বাঁধের উপরের অংশে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করে গড়াই নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করা।

২) হিসনি নদীর মাধ্যমে মাথাভাঙ্গা নদীর মুখ উন্মুক্ত করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নদ-নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করা (চিত্র ১০)।

পদ্মা নদীর উপরে বাঁধ/ব্যারাজ নির্মাণ করে বাঁধের উপরের অংশে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করে গড়াই নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করা

প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে পদ্মা নদীতে বাঁধ দিয়ে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করে গড়াই নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে গড়াই অববাহিকায় মিষ্টিপানির স্বল্পতা দূর করার কথা ভাবা হয়েছে। পদ্মা বাঁধ নির্মাণের একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য প্রাথমিকভাবে বিশেষজ্ঞগণ ৫টি স্থান চিহ্নিত করেন-

১। হার্ডিঞ্জ সেতুর ২ কিলোমিটার ভাটিতে, ২। গড়াই নদীর মুখে তালবাড়িয়ায়, ৩। গড়াই নদীর মুখ থেকে ১০

চিত্র : ১০ পদ্মা ব্যারেজ এর মাধ্যমে প্রবাহ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা

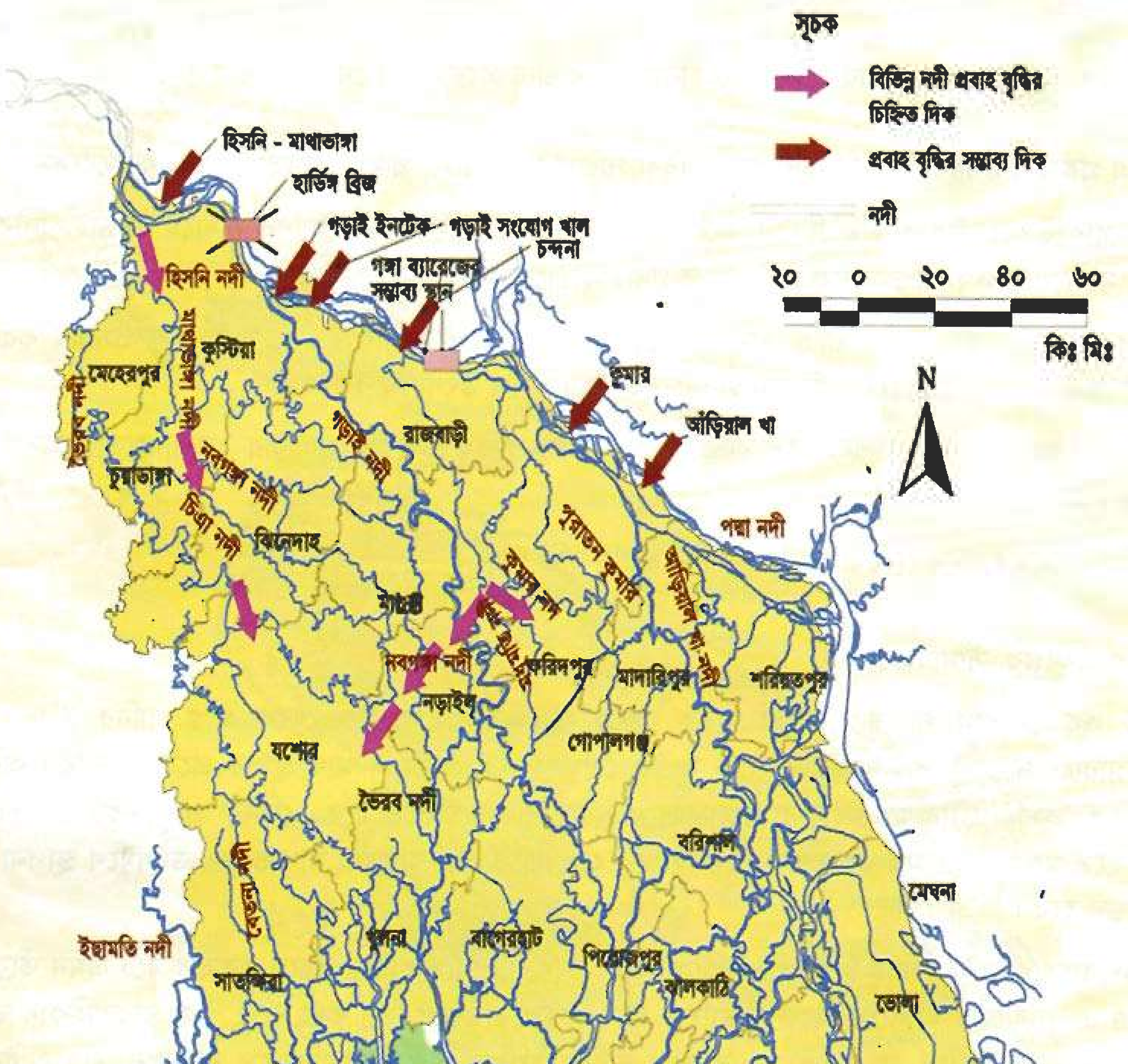

কিলোমিটার ভাটিতে ঠাকুরবাড়িতে, ৪। গড়াই নদীর মুখ থেকে ৩৬ কিলোমিটার ভাটিতে পাংশায় এবং ৫। পাংশার ১৫ কিলোমিটার ভাটিতে রাজবাড়িতে। তবে চূড়ান্ত বিবেচনায় বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন পাংশা এবং ঠাকুরবাড়ি স্থান ব্যারাজ নির্মাণের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত (এনডব্লিউএমপি, ২০০২)। সে কারণে পরবর্তীতে পাংশা এবং ঠাকুরবাড়িতে ব্যারাজ নির্মাণের প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই করে বিশেষজ্ঞরা বলেন উভয় স্থানেই ব্যারাজ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত এবং ঠাকুরবাড়ি বা পাংশায় ব্যারাজ নির্মাণ করা হলে প্রায় একই ফলাফল পাওয়া যাবে। বলা হয় পাংশায় ব্যারাজ নির্মাণ করা হলে ৯০৯ মিলিয়ন ঘন মিটার এবং ঠাকুরবাড়িতে ব্যারাজ নির্মাণ হলে ৭৯৪ মিলিয়ন ঘন মিটার পানি সঞ্চয় করা সম্ভব হবে। এ ব্যারাজে তীব্র বন্যার পানি সহজে নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় গেটের ব্যবস্থা রাখা হবে।

প্রস্তাবিত এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যাবে বলে প্রস্তাব প্রণেতাগণ উল্লেখ করেছেন

- পদ্মা নদীর উপরে বাঁধ/ব্যারাজ নির্মাণ করে বাঁধের উপরের অংশে সঞ্চিত পানির মাধ্যমে গড়াই নদীর প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মিষ্টিপানির প্রবাহ বাড়ানো সম্ভব হবে।
- ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্তি, খরা পরিস্থিতি মোকাবেলা ও এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা সহজ হবে। কেবলমাত্র ভূ-উপরোস্থ পানি ব্যবহার করেই প্রচুর ফসল উৎপাদন করা যাবে।
- গড়াই নদীতে পলি অবক্ষেপনজনিত কারণে সৃষ্ট দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের জলাবদ্ধতা সমস্যা কিছুটা হলেও নিরসন হবে।
- বাংলাদেশে সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে মিষ্টিপানির প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে।

প্রস্তাবিত এ প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা

- পদ্মায় শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা নির্ভর করবে ফারাক্কা বাঁধ/ব্যারাজ থেকে প্রাপ্ত পানির উপর। পাংশা বাঁধ/ব্যারাজ পয়েন্টে পানির উচ্চতা ৩০ ফুটের বেশি হলেই ঐ পানি মাথাভাঙ্গায় প্রবেশ করবে। অন্যদিকে মাথাভাঙ্গা/হিসনি নদীর মুখও খোলা রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা প্রাকৃতিকভাবে পদ্মার মূল ধারা হতে মাথাভাঙ্গার মুখ কখনও কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এ অবস্থায় মাথাভাঙ্গার উৎসমুখে স্থাপনা তৈরীর প্রয়োজন হবে।
- প্রকৌশলগত এবং গাণিতিক দিক থেকে হিসেব করে দেখান হয়েছে হাজার বছরে একবার ঘটে এমন তীব্র বন্যার পানিও এ ব্যারাজের মাধ্যমে সহজে নিষ্কাশিত হবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে, গঙ্গা অববাহিকায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিপূর্বে যে সকল বাঁধ/ব্যারাজ নির্মিত হয়েছে পলি জমার কারণে বর্তমানে তার অধিকাংশের কার্যকরিতা লোপ পেয়েছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা, বিহারের কোশি ও মহাকালী নদীর অববাহিকায় সাম্প্রতিক কালে সংঘটিত তীব্র বন্যা এর জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রস্তাবিত পদ্মা বাঁধ/ব্যারাজ নির্মিত হলে বাঁধের ভিতরের অংশে এমনকি বাইরের অংশেও পলি অবক্ষেপিত হয়ে বাঁধের কার্যকারিতা দ্রুত হ্রাস করে দিতে পারে।

হিসনি নদীর মাধ্যমে মাথাভাঙ্গা নদীর মুখ উন্মুক্ত করে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে নদ-নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করা

মাথাভাঙ্গা-হিসনি সংযোগ খাল (চিত্র-১১ সংযোগ খাল-১) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় মিষ্টিপানির প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট প্রস্তাবনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় গঙ্গা নদী নির্ভরশীল

চিত্র : ১১

পদ্মা ব্যারাজের মাধ্যমে প্রবাহ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা

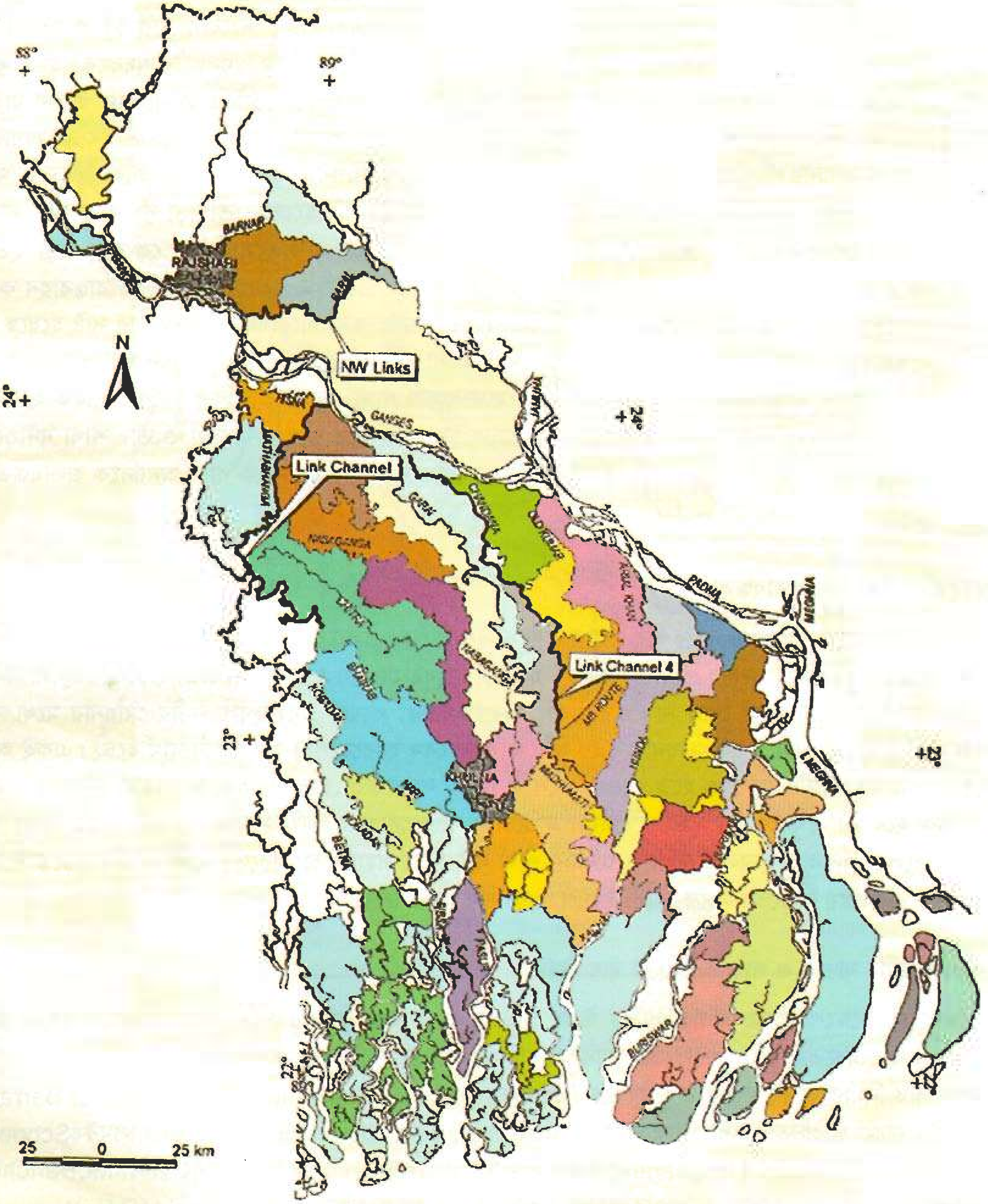

এলাকায় মিষ্টিপানির প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঙ্গা/পদ্মার মূল ধারা হতে কয়েকটি সংযোগ খাল খনন/পুনঃখননের প্রস্তাব করা হয়েছে। এলাকার উপর লবণাক্তপানির প্রভাব বিষয়ক মডেলিং করে দেখা গেছে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য গড়াই নদী দিয়ে ন্যূনতম ১৫০ ঘনমিটার/সেঃ এবং অন্যান্য নদী দিয়ে (কপোতাক্ষ,বেতনা, মুক্তেশ্বরী ও হরি) ১০০ ঘনমিটার/সেঃ পানি প্রবাহের প্রয়োজন (ওজিডিএ,২০০২)। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে সব সংযোগ খালের বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাব করা হয়েছে তা হলো মাথাভাঙ্গা-হিসনি সংযোগ খাল, চন্দনা নদী সংযোগ খাল ইত্যাদি। সম্প্রতি প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে মাথাভাঙ্গা-হিসনি সংযোগ খাল(সংযোগ খাল-১) ও চন্দনা নদী সংযোগ খাল (সংযোগ খাল-৪) সর্বোৎকৃষ্ট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বিশেষকরে বৃহত্তর খুলনা যশোর এলাকার জন্য সংযোগ খাল-১ এর গুরুত্ব অপরিসীম (চিত্র ১১)। মূলত প্রস্তাবিত এ সংযোগ খালের মাধ্যমে হিসনি এবং মাথাভাঙ্গার পুনর্জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রস্তাবনা। কারণ প্রায় ১৪০/১৪৫ বৎসর মাথাভাঙ্গা অববাহিকায় মিষ্টিপানির অভাবের কারণে নানান ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, জলাবদ্ধতা এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কৃষিক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের পশ্চিমাংশে কম লবণসহনশীল গাছপালা ধ্বংস হয়েছে এবং অধিক লবণসহনশীল কেওড়া, ওড়া ইত্যাদি গাছের বিস্তার ঘটেছে। তাই প্রস্তাবনার এই অংশটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে দীর্ঘ দেড়শত বৎসর ধরে মাথাভাঙ্গা নদীর উৎসমুখ বন্ধ হওয়ার জন্য ধীরে ধীরে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার কিছুটা উপশম হতে পারে, ফিরে পেতে পারে কপোতাক্ষ, বেতনা, শ্রী, হরি, ভদ্রা, ভৈরব ইত্যাদি নদী তাদের জীবন। হিসনি নদীর মাধ্যমে মাথাভাঙ্গা নদী উন্মুক্ত করা হলে মাথাভাঙ্গার শাখা প্রশাখা প্রাকৃতিক ঢালে প্রবাহিত হবে বলে নতুন করে সংযোগ খাল খননের প্রয়োজন হবে না। ভাটার চাপ বৃদ্ধি হবে বলে মাথাভাঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলোর তলদেশে জমে থাকা পলি অপসারিত হয়ে একদিকে যেমন নদীগুলো পুনর্জীবন ফিরে পাবে অন্যদিকে জলাবদ্ধতারও নিরসন হবে।

প্রস্তাবিত এ প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা

হিসনি নদীর মাধ্যমে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রস্তাব মনে হলেও বিষয়টি বাস্তবতার নিরিখে দেখার প্রয়োজন আছে। ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে গঙ্গার পানি প্রত্যাহার করে হুগলী নদীকে যথাযথভাবে নাব্য রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ ফারাক্কা পয়েন্ট এবং হুগলী নদীর মোহনার মধ্যে দূরত্ব অধিক থাকায় বর্ধিত পানি প্রবাহ মোহনার কাছে তার কার্যকর বেগ হারিয়ে পলি অপসারণে ব্যর্থ হচ্ছে। একই অবস্থা বাংলাদেশের মাথাভাঙ্গার ক্ষেত্রেও হতে পারে। ফলে এলাকায় লবণাক্ততা হ্রাস পেলেও জলাবদ্ধতা নিরসনে কতটুকু ইতিবাচক হবে তা এখনই বলা দুরূহ। তাছাড়া মাথাভাঙ্গা বাংলাদেশের একটি সীমান্তবর্তী নদী। এই নদীর পানি প্রবাহ বাড়লে মুর্শিদাবাদের জলাঙ্গী নদী ও অন্যান্য শাখা নদী দিয়ে সহজে তা ভারতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে । সে কারণে এ বিষয়ে ভারতের সংগে যৌথ আলাপ আলোচনা করার প্রয়োজন হতে পারে।

৯.৩ পদ্মা নদীর মাওয়া ও পাকশী পয়েন্টে বাঁধ নির্মাণ

এ প্রস্তাবনার উদ্দেশ্যে হচ্ছে গঙ্গার পানির উপর নির্ভরশীল না হয়ে যমুনার পানি দিয়ে বাংলাদেশের প্রয়োজন মেটানো এবং ভারতের দক্ষিনাংশ পর্যন্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে পদ্মা নদীর মাওয়া ও পাকশী পয়েন্টে বাঁধ নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রকল্প Farakka, Paksi, Mawa, Complex of Barrages (FPMC) নামে পরিচিত। ২০০১ সালে National Water Management Plan তৈরীর সময় School of Oriental and African Languages, University of London, UK পানি বিশেষজ্ঞ Mr.Barichieri-Colombic এ প্রস্তাবনা করেন। এ প্রস্তাবনার লক্ষ্য হলো ঃ

চিত্র : ১২ পাকশি ও মাওয়া পয়েন্ট এর মাধ্যমে প্রবাহ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা

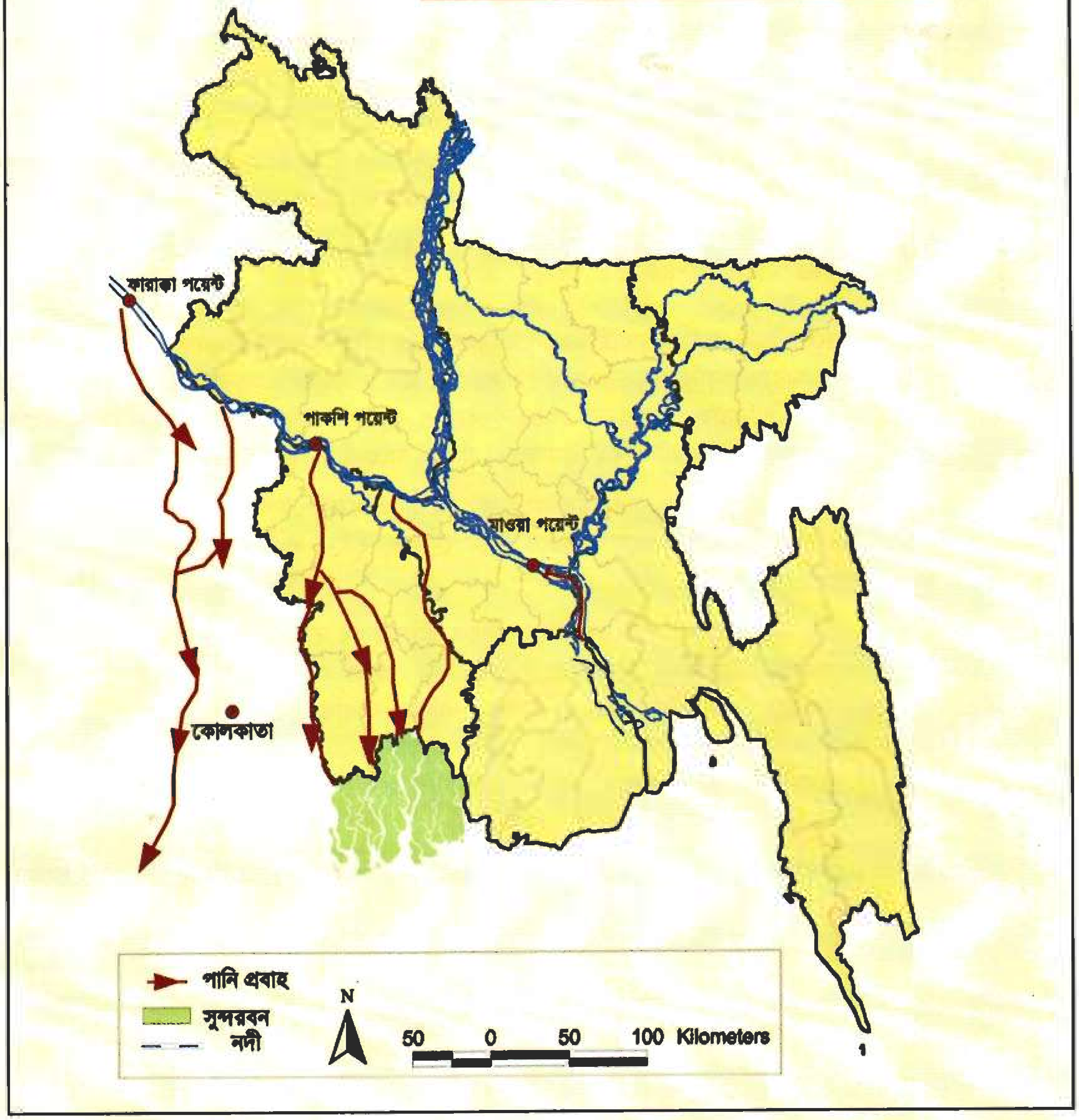

পদ্মা নদীর মাওয়া ও পাকশী পয়েন্টে বাঁধ/ব্যারাজ নির্মাণ করা। পরবর্তীতে সঞ্চিত পানি বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে এমনকি ভারতের দক্ষিণ অংশে প্রবাহের ব্যবস্থা করা।

মাওয়া পয়েন্ট থেকে ধলেশ্বরী নদীর মাধ্যমে পানি উত্তর মধ্য অঞ্চল (North Central Region), আড়িয়াল খাঁ নদীর মাধ্যমে দক্ষিণ মধ্য অঞ্চল (South Central Region) এবং গড়াই নদীর মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (South West Region) পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

- মাওয়া পয়েন্টে ব্যারাজ নির্মাণ করে সঞ্চিত পানি পাম্পের সাহায্যে ১০ মিটার উঁচুতে পাকশি পয়েন্টে এবং পাকশি পয়েন্ট থেকে পাম্পের সাহায্যে ৮ মিটার উঁচুতে ফারাক্কা পয়েন্টে উত্তোলন করা হবে। অর্থাৎ এ প্রকল্পে সর্বমোট পাম্পের সাহায্যে পানি ১৮ মিটার উঁচুতে উত্তোলনের প্রয়োজন হবে। পরবর্তীতে ফারাক্কা থেকে বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে পানি কলকাতা এবং মহানদী দিয়ে পেনিনসুলার ইন্ডিয়ার নদীতেও প্রবাহিত করা হবে ।
- পাকশী পয়েন্টের পানি মাথাভাঙ্গা নদীর মাধ্যমে সুন্দরবনসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাহের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই ভাবে কপোতাক্ষের মাধ্যমেও পানি সুন্দরবন এলাকায় প্রবাহ করানো হবে। বর্ধিত পানি জোয়ার বাহিত পলির অবক্ষেপনজনিত জলাবদ্ধতা ও সুন্দরবনসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ততা প্রশমনে সাহায্য করবে।
- মাওয়া ও পাকশী পয়েন্টে পানি উত্তোলনের পাম্প চালানোর জন্য বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসকে ব্যবহার করা হবে।

প্রস্তাবিত এ প্রকল্প বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ প্রকল্প। বিশেষজ্ঞদের প্রত্যাশা প্রস্তাবিত এ প্রকল্প শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয় বরং ভারতের পানি সমস্যার আংশিক সমাধান হবে। তাছাড়াও অনেকে মনে করেন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গঙ্গা ও যমুনার পানিসম্পদ নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থান অর্জন করতে পারবে। তবুও সমালোচকদের দৃষ্টিতে প্রকল্পটির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। নিম্নে সীমাবদ্ধতাগুলি উপস্থাপিত হলো ঃ

- ভারত যদি ব্রক্ষপুত্র-গঙ্গা সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে তাহলে এ প্রকল্পের কোন কার্যকারিতা থাকবে না। তাছাড়া ব্রক্ষপুত্র নদীর উপর যে কোন হস্তক্ষেপ করতে গেলে নেপাল, ভূটান, ও চীনসহ সংশ্লিষ্ট সকল দেশের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন হবে।
- যমুনা একটা অস্থিতিশীল নদী। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ভূমিকম্পের দরুণ ব্রক্ষপুত্র তার পুরনো গতিপথ পরিবর্তন করে নগর জনপদ ভেঙ্গে যমুনা নাম নিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে এর দুই তীর এখনও যথাযথ স্থায়ী হয়নি। সে কারণে এ নদীতে ভাঙ্গনপ্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এদিকে ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মার প্রবাহ হ্রাস হবার ফলে বর্তমানে আরিচা থেকে যমুনা পয়েন্ট পর্যন্ত পদ্মা নদীও যমুনার এই অস্থিতিশীল চরিত্র ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় মাওয়া পয়েন্টে বাঁধ নির্মাণ করলে তা কতটা টেকসই হবে সে বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে।
- ১৯৮৮ সালের মতো কখনও যদি ব্রক্ষপুত্র এবং পদ্মা নদীতে একই সংগে বন্যা হয় তাহলে পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ হতে পারে।
- নদীবক্ষে উপর্যুপরি পলি সঞ্চয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে, পলির অবক্ষেপন একটা বড় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে প্রকল্পের কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে।
- সর্বোপরি পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলন একটি ব্যয়বহুল ব্যাপার, আমাদের মত দেশের পক্ষে সেটি বাস্তবায়ন করা কতটা সম্ভব হবে তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

সামগ্রিক পর্যালোচনায় এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের বর্তমান প্রধান সমস্যা হলো এলাকায় মিষ্টিপানির স্বল্পতা, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং মাথাভাঙ্গা নদীর শাখা নদী সমূহের নিম্নাংশে অব্যাহত পলি অবক্ষেপন। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের এসব সমস্যার সমাধান, নদ-নদীসমূহ পুনর্জীবিত করা বা নাব্যতা বৃদ্ধি করতে চাইলে মাথাভাঙ্গা নদী পুনর্জীবিত করার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব হতে পারে। মাথাভাঙ্গা নদীর বন্ধ মুখ খনন করে অথবা শুষ্ক মৌসুমে পাম্পের মাধ্যমে মাথাভাঙ্গা চ্যানেলে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করে নদীকে পুনর্জীবিত করা সম্ভব। তবে এ বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা করা প্রয়োজন। কোন বড় পরিকল্পনা গ্রহনের পূর্বে এ বিষয়ে আরো

অনুসন্ধান ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। দক্ষ ও অভিজ্ঞ গবেষকদের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের আলোকে এবং এলাকার পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের কথা বিবেচনায় রেখে মাথাভাঙ্গা নদী পুনর্জীবনের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০. উপজেলা ভিত্তিক জলাবদ্ধ অঞ্চল, জলাবদ্ধতার কারণ ও সমাধানে করণীয়

জলাবদ্ধতার প্রকৃত স্বরূপ, তার ভৌগলিক অবস্থান, কারণ ও সমাধানের সম্ভাব্য পন্থা নির্ধারণের জন্য উপজেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে জলাবদ্ধতা সম্পর্কিত তথ্য জানা একান্তই জরুরী। জলাবদ্ধতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও করণীয় নির্ধারণের জন্য উত্তরণ ও পানি কমিটির যৌথ উদ্যোগে জলাবদ্ধ ১১ উপজেলায় ১১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা, খুলনা ও যশোর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালাগুলিতে জলাবদ্ধতা কবলিত এলাকার সুধীজন, ভূক্তভোগী জনগণ, পানি কমিটির নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, সমাজকর্মী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, জলাবদ্ধতা নিরসনের আন্দোলনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ, সরকারী প্রশাসন প্রতিনিধি, এনজিও কর্মী ও মহিলা ইউপি সদস্যসহ বিভিন্ন স্তরের জনগণ উপস্থিত ছিলেন। উত্তরণ বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে অতিরিক্ত আরও ৪টি উপজেলার জলাবদ্ধতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও উত্তরণ এর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নের ১৫টি উপজেলার জলাবদ্ধ অঞ্চল, জলাবদ্ধতার কারণ ও সম্ভাব্য সমাধান চিহ্নিত করা হয়। নীচে সেগুলো উপজেলা ভিত্তিক উল্লেখ করা হলো।

১। কলারোয়া উপজেলা

কলারোয়া উপজেলা সাতক্ষীরা জেলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত (চিত্র -১৩)। এ উপজেলার উত্তরে যশোর জেলার মনিরামপুর, ঝিকরগাছা ও শার্শা উপজেলা, পূর্বে কেশবপুর, দক্ষিণে সাতক্ষীরা জেলার সাতক্ষীরা ও তালা উপজেলা এবং পশ্চিম সীমান্তে ভারতের অবস্থান। এ উপজেলায় ধান, গম, পাট, পেয়াজ, রসুন, আলু ও নানা প্রকার সবজি উৎপাদন হয়। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। কপোতাক্ষ নদ ও বেতনা এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদী। জলাবদ্ধতা ও খাবার পানিতে আর্সেনিক ও আয়রণের উপস্থিতি এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

কলারোয়া উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা চিত্র : ১৩

জলাবদ্ধ এলাকা

জলাবদ্ধ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়

- জয়নগর ইউনিয়নের গাজনা ক্ষেত্রপাড়া, রামকৃষ্ণপুর, বসন্তপুর, মানিকনগর, খোরদোবাটরা, নীলকণ্ঠপুর, কৃষ্ণরামপুর, ধানদিয়া, দক্ষিণজয়নগর গ্রামগুলোর বেশিরভাগ এলাকা।
- যুগিখালী ইউনিয়নের মানিকনগর, রাজনগর, যুগিখালী, পাইকপাড়া, কামারালী, রামনালী, গোছমারা এবং ওকাপুর রামনালী গ্রাম।
- দেয়াড়া ইউনিয়নের খোরদো, পাকুড়িয়া, দেয়াড়া, মাঠপাড়া, মধ্যদেয়াড়া, কাশিয়াডাঙ্গা, ছলিমপুর, পাঠুলিয়া, উলুডাঙ্গা, দলইপুর এলাকা।
- কুশডাঙ্গা ইউনিয়নের শাকদহা, পানি কাউরিয়া, গোয়ালচাতর, আটুলিয়া, সিমান্দকাটি, লক্ষিখোলা, পিছলাপোল, কুশডাঙ্গা, মোহনপুর, ও রায়াটা গ্রামের বেশিরভাগ এলাকা এবং আহসাননগর, সিংহলাল, নারায়নপুর ও বৈদ্যপুর গ্রাম।
- জালালাবাদ ইউনিয়নের সকল গ্রাম।
- কলারোয়া পৌরসভার মির্জাপুর, মুরারীকাটি, গোপীনাথপুর, সিকড়া, গদখালী ও কলারোয়া বাজার।

জলাবদ্ধতার কারণ

- কপোতাক্ষ ও বেত্রাবতী (বেতনা) নদী পলিজমে দ্রুত ভরাট হওয়া।
- পানি নিষ্কাশনের জন্য ক্ষেত্রপাড়া, জয়নগর, লষ্কর, বাসনালী নৌখাল, আঙ্গুলকাটা, বুইতা, বাটরা, একড়া, শংকরপুর, জালালাবাদ ও মানাঘাটা খাল দীর্ঘদিন সংস্কার না করা।
- নদীচর অবৈধ দখল করে ঘের নির্মাণ এবং বাঁধ দিয়ে পানি চলাচল বন্ধ করা, নদীতে পাটা বা পালা দেয়া।
- স্লুইসগেট ভরাট হওয়া ।
- কৃষি জমি থেকে নদীর উপচেপড়া পানি এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকা।

সম্ভাব্য সমাধান

- কপোতাক্ষ ও বেতনা নদী পুনখনন করে প্রবাহ বৃদ্ধি করা এবং নদীতে জোয়ার-ভাটা ব্যবস্থা চালু রাখা।
- উজানের সঙ্গে কপোতাক্ষের ও বেতনা নদীর পুনসংযোগ করা।
- পানি নিষ্কাশনের জন্য ক্ষেত্রপাড়া, জয়নগর, হরিদা, চতুরবাড়িয়া, লষ্কর, বাসনালী নৌখাল, আঙ্গুলকাটা, বুইতা, বাটরা, একড়া, শংকরপুর, জালালাবাদ ও মানাঘাটা খাল সংস্কার করা।
- ধাড়িয়া খালের স্লুইসগেট সংস্কার, একড়া ও ঘরচালা সড়কের মাঝখানের কৃত্রিম বাঁধ অপসারণ করা।

- নদী চরাঞ্চলের খাসজমি অবৈধ দখল মুক্ত করা।
- নদী ও খাল থেকে সকল পাটা ও পালা অপসারণ করা, খালের উপরের কৃত্রিম বাঁধ অপসারণ করা।
- জোয়ারের পানিতে আসা পলির বিকল্প স্থানে অবক্ষেপনের ব্যবস্থা করা (টিঅরএম চালু করা)।

২। দেবহাটা উপজেলা

দেবহাটা উপজেলা বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত (চিত্র-১৪)। সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত এ উপজেলার উত্তরে সাতক্ষীরা সদর, পূর্বে আশাশুনি, দক্ষিণে কালিগঞ্জ উপজেলা ও পশ্চিম সীমান্তে ভারতের অবস্থান। এ উপজেলার অধিকাংশ এলাকা নীচু ও সমতল এবং প্রতিদিন ২বার জোয়ার ভাটায় প্লাবিত হয়। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। কিছু পরিবারের লোকেরা নদীতে বাগদা পোনা ধরা, মাছ ধরা ও সুন্দরবন নির্ভর বিভিন্ন পেশায় জড়িত। ধান এ উপজেলার প্রধান ফসল। বর্তমানে এখানে বাগদা চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। মাটি ও পানিতে অধিক লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও খাবার পানির সংকট এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

চিত্র-১৪

দেবহাটা উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ জেলাঃ সাতক্ষীরা

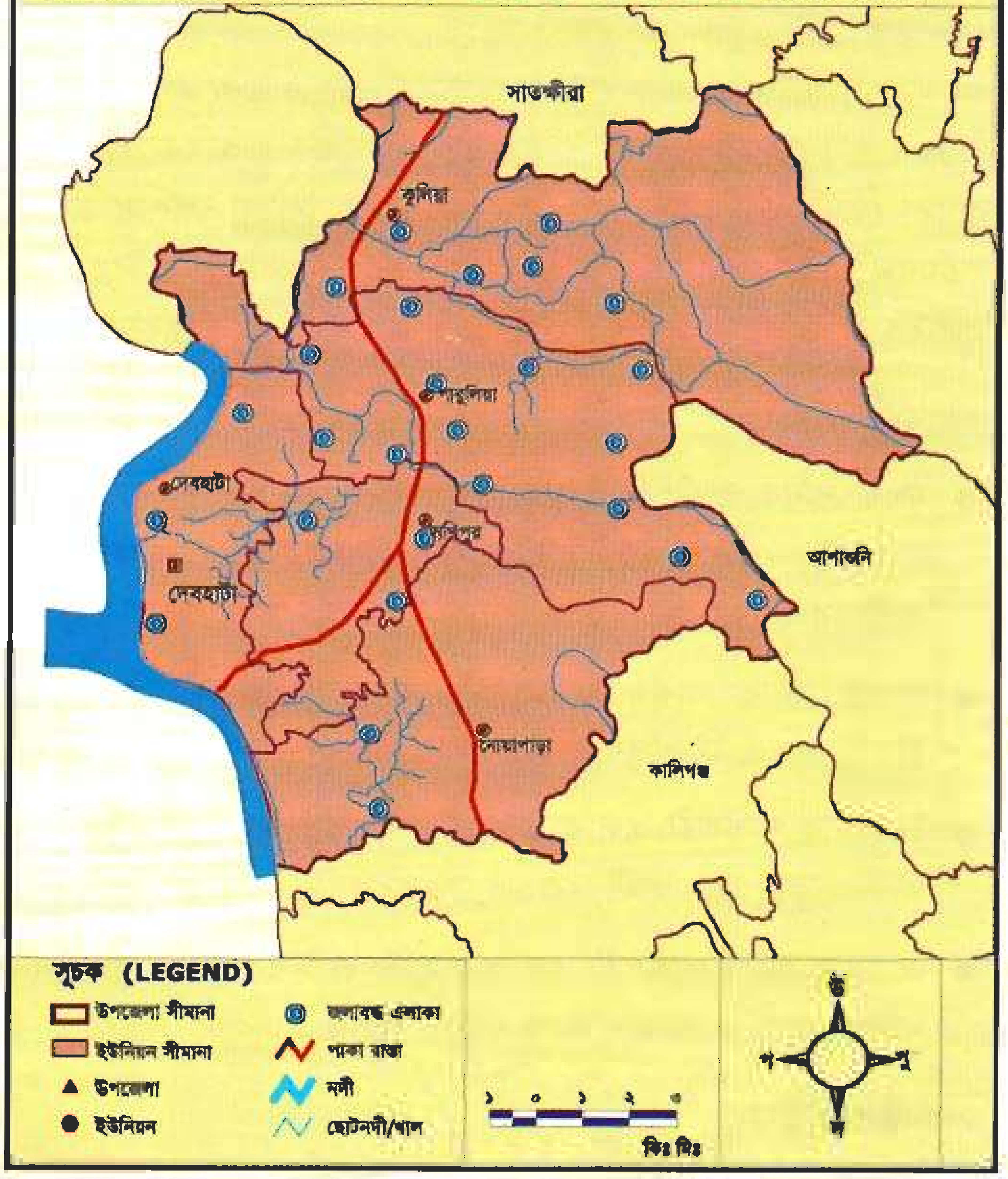

জলাবদ্ধ এলাকা

দেবহাটা উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের কম বেশি এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। জলাবদ্ধ এলাকাসমূহ হলো :

- পারুলিয়া ইউনিয়নের সীমান্ত ট্রেড স্কুল এলাকা, সাগরসাহ দিঘি অঞ্চল, খেজুরবাড়িয়া গেট এলাকা থেকে ধোপাডাঙ্গা পর্যন্ত ।
- কুলিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ কুলিয়া পাতনার বিলের মাঝখানে কুশিখাল অঞ্চল, হিরের চক আলমগীরের বাড়ি হতে শাহাবুদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত ।
- সখিপুর ইউনিয়নের নারিকেলি ও বেমেরাটি খাল অঞ্চল, চিলেডাঙ্গা রাস্তা হতে তালতলা পুল এলাকা পর্যন্ত, সখিপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পূর্ব পার্শ্বের মাঠ সহ পাশের বিল অঞ্চল, সখিপুর মহিলা কলেজের সামনে সড়ক ও জনপথ বিভাগের রাস্তার পূর্ব ও পশ্চিম পাশ ।
- দেবহাটা ইউনিয়নের টাউন শ্রীপুর স্লুইসগেট থেকে ভাতশালা আঙ্গুলকাটা এলাকা ।
- ধোলাইতলা ও নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ঘোনাপাড়া ও নোয়াপাড়া মাঠ অঞ্চল।

জলাবদ্ধতার কারণ

- অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষের ঘের নির্মাণ ও ভেড়িবাঁধ দিয়ে বিলের পানি নিষ্কাশন পথ বন্ধ করা।
- নিষ্কাশন খালসমূহ ভরাট ও অবৈধ দখল হওয়া।

সম্ভাব্য সমাধান

- ভরাট ও মজে যাওয়া সেচ খালগুলো পুনঃখনন ও অবৈধ দখল মুক্ত করা (চিলমারী খাল, হালদারখালি খাল, বেমোরাটি খাল,ধোলাইখাল, তালতলা খাল, গোপাখালি খাল)।
- এলাকার পানি নিষ্কাশন পথ রেখে পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি ঘের নির্মাণ করা।

৩। শ্যামনগর উপজেলা

সুন্দরবন সংলগ্ন উপজেলা হলো শ্যামনগর (চিত্র-১৫)। সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত এ উপজেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কালিগঞ্জ, উত্তরে আশাশুনি, পূর্বে খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা, পশ্চিম পাশে ভারতের সীমান্ত এলাকা এবং দক্ষিণের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন। যমুনা, চুনার, কালিন্দি, মাদার, কদমতলা, আইবুড়িসহ বেশ কিছু ছোটবড় নদী এ উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ উপজেলার সকল ভূমি দিনে ২ বার জোয়ার ভাটায় প্লাবিত হয়। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। কিছু পরিবারের লোকেরা নদীতে বাগদা পোনা ধরা, মাছ ধরা, সুন্দরবন নির্ভর বিভিন্ন পেশায় জড়িত। ধান এ উপজেলার প্রধান কৃষিজাত ফসল। বর্তমানে এখানে বাগদা চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। মাটি ও পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদী ভরাট, জলাবদ্ধতা ও খাবার পানির সংকট এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

জলাবদ্ধ এলাকা

- যমুনা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভুরুলিয়া, শ্যামনগর, রমজান নগর ও ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের খানপুর, ইছাপুর, বাধখাটা, গোপালপুর, হায়বাতপুর, ইসমাইলপুর, খাগড়াদানা, মাজাট, মাহমুদপুর, ফুলবাড়ি, চিংড়িখালী, বংশীপুর ও সোনাখালী গ্রাম।
- মাদার নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় নুরনগর কৈখালী ও রমজাননগর ইউনিয়নের মানিকপুর, সৈয়দালীপুর, রামজীবনপুর, মির্জাপুর, চিংড়িখালীর একাংশ, সোরা ও ভেটখালী গ্রাম।
- চুনানদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় শ্যামনগর, কাশিমারি, ঈশ্বরীপুর আটুলিয়া ও বুড়িগোয়ালিনি ইউনিয়নের হাটছালা, পাটনিপুকুর, জাবাখালী, কেওল, শংকরকাটি, গুমনতলী, চরের বিল ও আবাদ চণ্ডিপুরসহ বিভিন্ন গ্রাম ।
- আইবুড়ি নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুন্সিগঞ্জ ঈশ্বরীপুর ও রমজাননগর ইউনিয়নের শ্রীকলকাটি, ধুমঘাট, মুন্সিগঞ্জ, মানিক খালী ও রমজান নগর গ্রামের বিল।

জলাবদ্ধতার কারণ

- যমুনা নদী ভরাট হওয়া।
- নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি চলাচল বন্ধ করা (মিঠে চণ্ডিপুর, চণ্ডিপুর ব্রীজের নিকটবর্তী এলাকায়, মিঠে চন্ডিপুর ইটভাটার পাশে, শ্যামনগর এসিল্যাণ্ড অফিসের পাশে বাবলাতলা মোড় ও মুক্তিযোদ্ধা অফিসের সামনের রাস্তা)।

- নদী ভরাট করে উপর দিয়ে সড়ক ও জনপদ বিভাগের রাস্তা নির্মাণ।
- পানখালীতে চুনানদীর উপর আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে স্লুইসগেট নির্মাণ ও স্লুইসগেটের ভিতরে আটুলিয়া থেকে চুনা ব্রীজ পর্যন্ত নদী ভরাট ও বেদখল হওয়া।
- আইবুড়ি নদী (শ্রীকলকাটি পাচু সরদারের মোড় হতে মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত) এবং কল্যাণখাল, নাটিমখালীর খাল ও সোরার খাল অবৈধ দখল ।
- পানি নিষ্কাশনের পথ না রেখে খাস জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান।
- মাদার, কালিন্দির ও যমুনা নদীর সংযোগ খালসমূহ ভরাট হওয়া ।

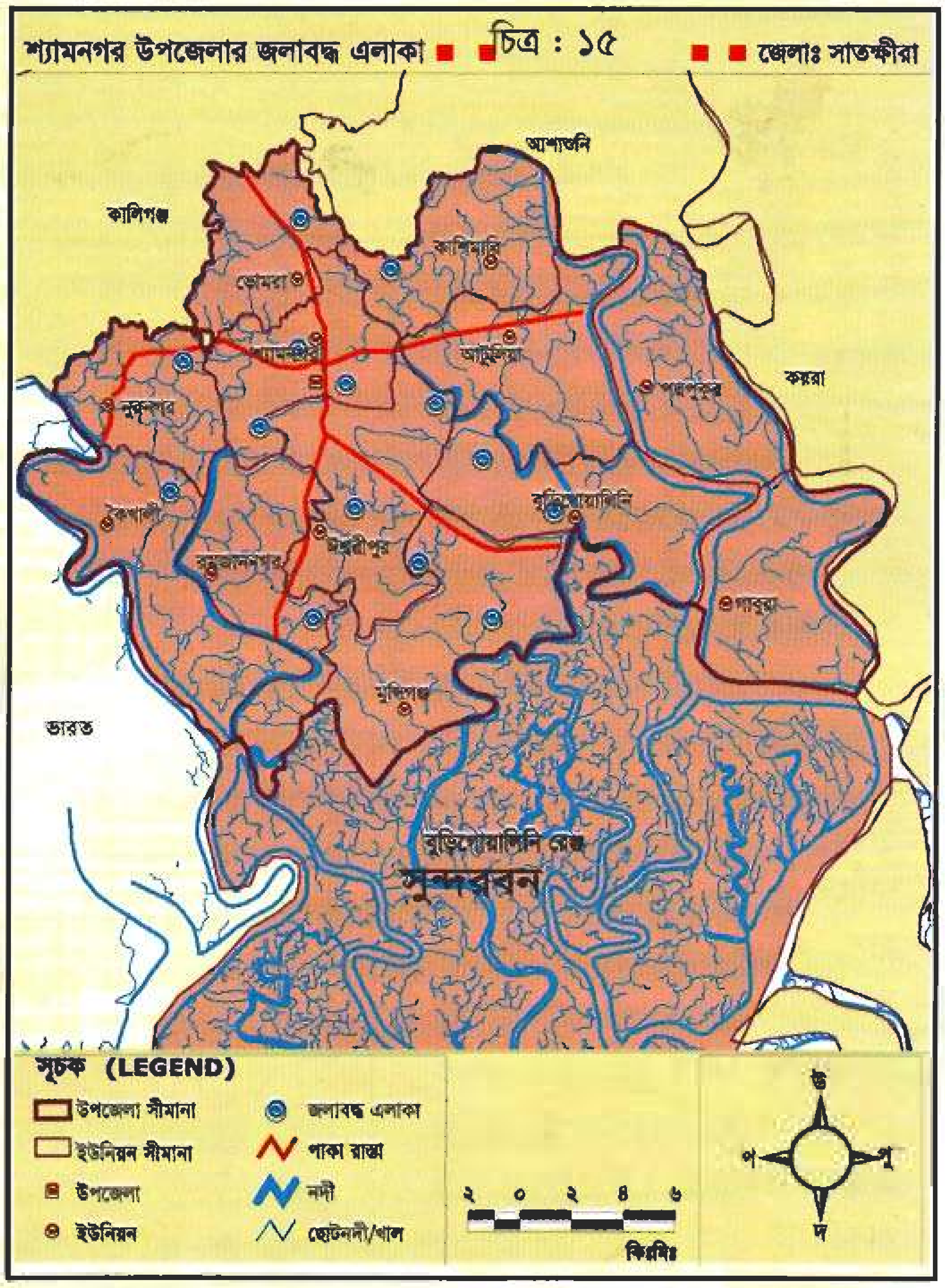

সম্ভাব্য সমাধান

- আইবুড়ি, মাদার, চুনা ও যমুনা নদীর বিভিন্ন স্থানে নির্মিত বাঁধ অপসারণ এবং নদী অবৈধ দখল মুক্ত ও পুনখনন করে নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করা।
- কল্যাণ, নটিমখালী ও সোরার খাল পুনরুদ্ধার ও ভরাটকৃত অংশ পুনখননকরা।
- কাকশিয়ালী নদীর স্লুইসগেটটি সংস্কার করা।

৪। কেশবপুর উপজেলা

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি বিজড়িত কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত (চিত্র-১৬)। এ উপজেলার উত্তর পাশে যশোর জেলার মনিরামপুর, পূর্ব ও দক্ষিণে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলার তালা ও পশ্চিম পাশে কলারোয়া উপজেলা অবস্থিত। কপোতাক্ষ, বুড়িভদ্রা, ভদ্রা ও হরিহর এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদী। সবজী উৎপাদনের জন্য এ উপজেলা সকলের নিকট পরিচিত। ধান,পাট, আঁখ, গম ও নানা প্রকার সবজী এ উপজেলার প্রধান ফসল। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। নদী ভরাট, জলাবদ্ধতা ও খাবার পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রণের উপস্থিতি এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

জলাবদ্ধ এলাকা

- ভদ্রা নদীর ক্যাসমেন্ট এলাকাঃ হিজেলডাঙ্গা, বাউশালা, পরচক্রা, ভবাণীপুর, হাড়িয়া ঘোপ, আঠগুা, লক্ষ্মীনাথকাটি, বাগদাহ, মজিদপুর, দেউলি, ফতেপুর, টিটা ও তালতলা।
- বগার স্লুইসগেটের আওতাধীন এলাকাঃ ঝিকরা, ফতেপুর , দাদপুর, গৌরীপুর, মমিনপুর, সাগরদাঁড়ী, চিংড়া, মির্জাপুর, মেহেরপুর, ধর্মপুর, বাঁশবাড়িয়া ও লালচন্দ্রপুর এলাকা।
- হরিহর নদীর অববাহিকা ও বলধালি নেংটাখালী বিল এলাকাঃ মধ্যকুল, হাসাডাঙ্গা, কেশবপুর, কোমরপুর, আলতাপোল ও বড়েঙ্গা গ্রাম ।
- বুড়ুলিয়া স্লুইসগেট এলাকাঃ পাজিয়া,ময়নাপুর, সুফলাকাটি, কমলাপুর বিল, বিল বুড়ুলীয়া, বিল গরালিয়া, হদ ও মাগুরখালী বিল এলাকা।
- আগরহাটি ও ভায়না স্লুইসগেট এলাকাঃ আগরহাটি, ভায়না, সারুটিয়া, দশকাউনিয়া, ভেরচী ও কাকবাঁধাল গ্রাম।

জলাবদ্ধতার কারণ

- বুড়িভদ্রা, হরিহর ও কপোতাক্ষ নদীতে পলি জমে নদীর নাব্যতা হ্রাস, এসব নদীর বিভিন্ন সংযোগ খাল ভরাট।
- কপোতাক্ষ নদীর ত্রিমোহনী থেকে বাকড়া হয়ে ঝিকরগাছা পর্যন্ত এলাকা সবসময় কচুরিপানায় ভর্তি থাকা।
- খাসখাল লীজ নিয়ে মাছ চাষ করা ও পানি নিষ্কাশনের পথ না রেখে অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি ঘের নির্মাণ।
- নরনিয়া ও বুড়ুলীয়া গেটের ভিতরে ও বাইরে ভরাট।
- বিলগুলির তুলনায় নদীর তলদেশ উঁচু হওয়া।
- পানি নিষ্কাশনের বিষয় বিবেচনা না করে বিলের মধ্যদিয়ে অসংখ্য পাঁকা ও কাঁচা রাস্তা নির্মাণ করা।

কেশবপুর উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা ■ ■ চিত্র : ১৬ ■ ■ জেলাঃ যশোর

সম্ভাব্য সমাধান

- বুড়িভদ্রা, হরিহর ও কপোতাক্ষ নদীর পলি ভরাট এলাকা চিহ্নিত করে পুনখনন করা এবং নদীর নাব্যতা রক্ষা করা।
- পানি নিষ্কাশনের সকল খাল পুনখনন করা (বাদুড়িয়া গেটের পিছন থেকে মঙ্গলকোট বাজার পর্যন্ত খাল, বগাখাল, টেপু বলধালী, নেংটাখালি খাল)।
- আগরহাটি ও ভায়না গেটের ভিতরের জলাবদ্ধ এলাকা, কেশবপুরের পূর্ব পার্শ্বের জলাবদ্ধ এলাকা ও সকল নদীর অববাহিকায় টিআরএম চালু করা।

৫। মনিরামপুর উপজেলা

মনিরামপুর উপজেলা যশোর জেলায় অবস্থিত (চিত্র-১৭)। এ উপজেলার পশ্চিমে যশোর জেলার ঝিকরগাছা, উত্তর দিকে যশোর, পূর্ব পাশে অভয়নগর, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া এবং দক্ষিণে কলারোয়া ও কেশবপুর উপজেলা অবস্থিত। কপোতাক্ষ, বেতনা, মুক্তেশ্বরী ও হরিহর এ উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত উল্লেখযোগ্য নদী। ধান, পাট, আঁখ, গম ও নানা প্রকার সবজী এ উপজেলার প্রধান ফসল। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। জলাবদ্ধতা ও খাবার পানিতে আয়রণ ও আর্সেনিকের উপস্থিতি এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

জলাবদ্ধ এলাকা

- যশোর কেশবপুর সড়কের পশ্চিম পাশের রাজগঞ্জ, লাউড়ী, ঝাপা, শাহাপুর, মমিননগর, হয়াতপুর, শ্যামকুড় চন্দুয়াহাটি, জামলা, চণ্ডিপুর, রৈতিয়া নেংড়ুয়া, পাড়দিয়া খেদাপাড়া, হাসাডাঙ্গা বলধালী ও চিনাটোলা;
- যশোর কেশবপুরে সড়কের পূর্ব পাশের বিল খুকশিয়া, ভবদহবিল, পায়রা, কালিবাড়ি, বিল বকর, ময়নাপুর, বিল কেদারিয়া ও ছিয়ানব্বই গ্রাম।

জলাবদ্ধ বিলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা

জলাবদ্ধতার কারণ

- কপোতাক্ষ,শ্রীনদী ও হরিহর নদী পলি জমে ভরাট হওয়া।
- কুশোর খাল, শ্যামকুড় ও লাউড়ীর খাল ভরাট হওয়া, মুক্তেশ্বরী নদীর সকল সংযোগ খালের বিভিন্নস্থানে বাঁধ ও পাটা দিয়ে খালের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করা।
- স্লুইসগেট ও পানি নিষ্কাশনের চ্যানেলগুলো সংস্কার না করা।
- বিলের মধ্যকার পানি সরানোর কথা বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট এবং বাঁধ নির্মাণ করা।
- খাস খাল ইজারা নিয়ে মাছের ঘের নির্মাণ করা।

সম্ভাব্য সমাধান

- কপোতাক্ষ,হরিহর, শ্রী নদী ও রাজগঞ্জ বাজারের উত্তরে গজশ্রী নদী পুনখনন করা।
- কপোতাক্ষ নদীর সঙ্গে বাওড়গুলির পুনঃসংযোগ স্থাপন ও সেখানে টিআরএম চালু করা।
- কুমোর খাল, বলধালী বিলের খাল ও বরান্দি হতে সতীঘাটা খাল পুনখনন করা।
- ভবদহ ২১ ভেন্ট এবং ৯ ভেন্ট স্লুইসগেটের মধ্যবর্তী স্থান কেটে দিয়ে ভবদাহের উপরের সকল বিলে জোয়ার ভাটা (টিআরএম) চালু করা।
- টিআরএম বাস্তবায়নের সময় বিলের অধিবাসীদের রিলিফ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- খাস খাল ইজারা না দিয়ে সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা।

৬। কালিগঞ্জ উপজেলা

বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে অবস্থিত সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা (চিত্র-১৮)। এ উপজেলার উত্তরে দেবহাটা, পূর্বে আশাশুনি, দক্ষিণে শ্যামনগর উপজেলা ও পশ্চিম সীমান্তজুড়ে ভারতের অবস্থান। এ উপজেলার অধিকাংশ এলাকা নীচু ও সমতল এবং প্রতিদিন ২বার জোয়ার ভাটায় প্লাবিত হয়। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর।

কিছু পরিবারের লোকেরা নদীতে বাগদা পোনা ও মাছ ধরা, সুন্দরবন নির্ভর বিভিন্ন পেশায় জড়িত। ধান এ উপজেলার প্রধান ফসল। বর্তমানে এখানে বাগদা চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। মাটি ও পানিতে অধিক লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও খাবার পানির সংকট এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

কালিগঞ্জ উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা চিত্র : ১৮ জেলাঃ সাতক্ষীরা

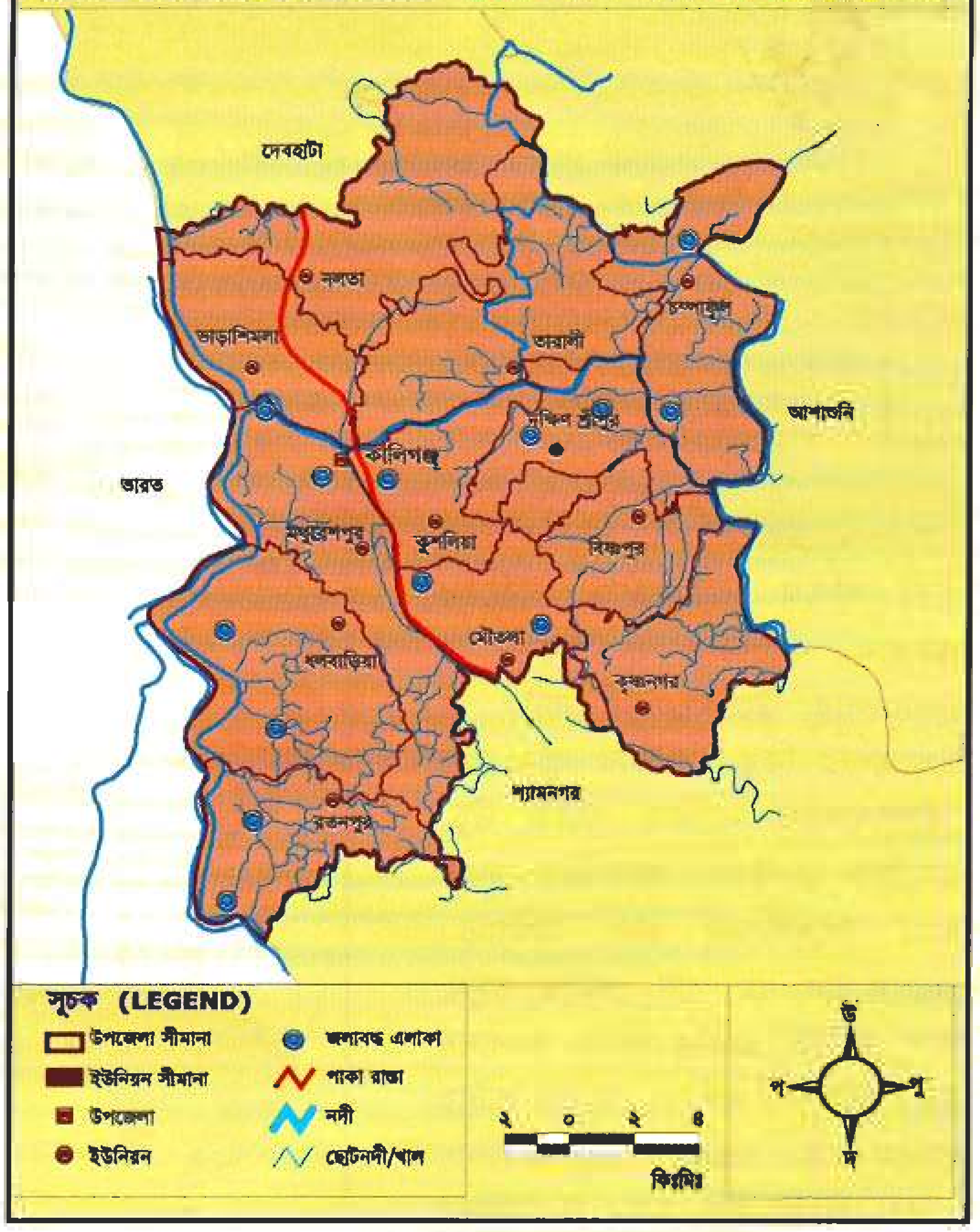

জলাবদ্ধ এলাকা

বাজার গ্রাম, রহিমপুর, কুলিয়া দূর্গাপুর, কাশেমপুর, মহৎপুর, পানিয়া, মৌতলা, বেড়াখালী, নেবুখালী, কালিকাপুর, সহিহাটি, উজিরপুর, যালনা, চাকুন্দিয়া, বসন্তপুর, গণগাতি, উত্তর শ্রীপুর, সোনাতলা, চুনাখালী, ছুনকা বিল, ভেমরাইল, গন্ধুলিয়া, মুড়া গাছা, উচ্চেপাড়া, মাদকাটি, তেলিখালী, মুইলপুর ও কামদেবপুর (বিল কাজলা, জায়েদানগরের আটটি গ্রাম, বিল দিয়া, ছনকা বিল, সরকার বরাদ্দ বিল, গোনালী বিল)।

জলাবদ্ধতার কারণ

- কাকশিয়ালী, যমুনা, কাটাখালী ও গলঘেষিয়া নদীর ন্যাব্যতা হ্রাস।
- পানি নিষ্কাশনের খাল সংস্কার না করা, অধিকাংশ খাল অপরিকল্পিত ভাবে ভরাট করে ব্যক্তি স্বার্থে দখল করে নেয়া।
- স্লুইসগেট ও কালভার্টসমূহ পানি নিষ্কাশনের উপযোগী না থাকা।
- পানি নিষ্কাশনের বিষয় বিবেচনা না করে অপরিকল্পিত ঘের, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ করা।

সম্ভাব্য সমাধান

- কাঁকশিয়ালী ও যমুনা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি এবং কাটাখালী ও গলঘেষিয়া নদীর স্রোত বৃদ্ধির সহায়ক ব্যবস্থা নেয়া।
- সি,এস জরিপে চিহ্নিত খালসমূহ উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় পুনখনন পূর্বক পানি চলাচলের উপযোগী করা।
- কালভার্টসমূহ উন্মুক্ত করা, ঘের নির্মাণের পূর্বে পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

- জলাবদ্ধ নীচু এলাকায় টিআরএম চালু করা।
- জায়েদা নগর, বিল কাজলা, বিল দিঘার কৃত্রিম জলাবদ্ধতা দূর করা।
- স্লুইসগেটসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পলি অপসারণ করে পানি নিষ্কাশনের উপযোগী করা।

৭। সাতক্ষীরা সদর উপজেলা

সাতক্ষীরা উপজেলা সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলা (চিত্র-১৯)। এ উপজেলার দক্ষিণে দেবহাটা উপজেলা, পূর্বে আশাশুনি ও তালা উপজেলা, উত্তরে কলারোয়া উপজেলা এবং পশ্চিম সীমান্তজুড়ে ভারতের অবস্থান। মরিচ্চাপ ও বৈকারী এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদী। এ উপজেলার কিছু এলাকার ভূমি লাল বেলেদোঁআশ মাটিতে গঠিত উঁচু, বন্যামুক্ত ও উর্বর। সাতক্ষীরা মূলত আম উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এখানে ধান, গম, পাট, পেয়াজ, রসুন, আলু ও নানা প্রকার সবজি উৎপাদন হয়। তবে নীচু এলাকা জোয়ার ভাটায় প্লাবিত হয়। বর্তমানে নীচু এলাকায় বাগদা চিংড়ি চাষ হয়। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদী ভরাট ও জলাবদ্ধতা এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

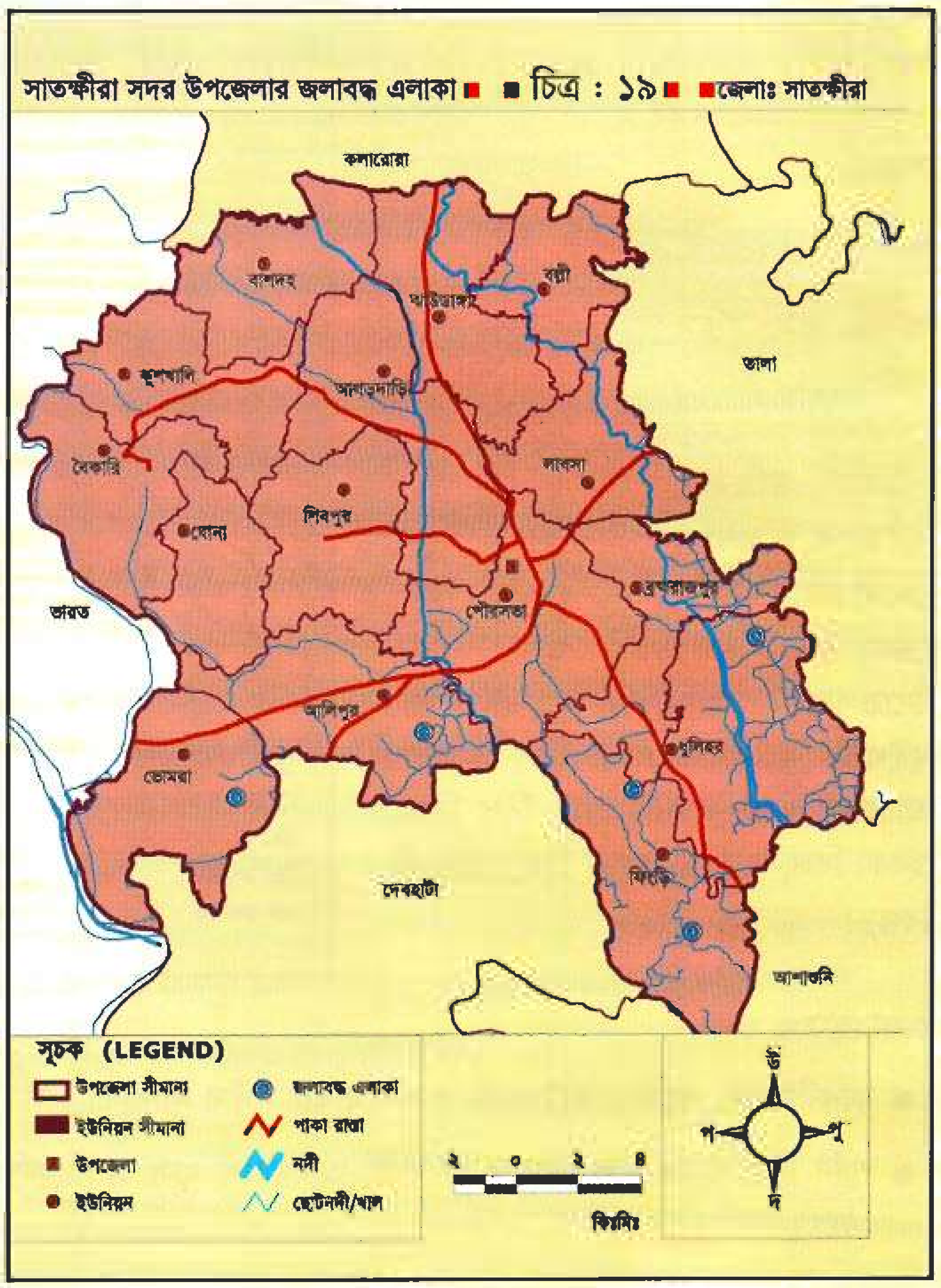

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা ■ ■ চিত্র : ১৯ ■ ■ জেলাঃ সাতক্ষীরা

জলাবদ্ধ এলাকা

- বেতনা ও মরিচ্চাপ নদীর মধ্যবর্তী ফিংড়ি, ধূলিহর ও ব্রহ্মরাজপুর ইউনিয়নের বুড়ামারা বিল, ঢেকুর বিল, পালিচাঁদ বিল, বেলার বিল, উত্তর খড়ির বিল, হাসানপুর বিল ও দক্ষিণ খড়ির বিল।
- লাবসা, বল্লী ও ঝাউডাঙ্গা ইউনিয়নের রাজনগর, ভাটপাড়া, খেলারডাঙ্গী, বলাডাঙ্গা, মেজুরডাঙ্গী, ঝাউডাঙ্গা, দেবনগর, রাজবাড়ি, মুকুন্দপুর, আখড়াখোলা ও ছাতিয়ান তলা, দাতভাঙ্গা বিল, মালিনী বিল ও গজালির বিল।

জলাবদ্ধতার কারণ

বেনেপোতা ব্রীজের পশ্চিম পাশের খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ভারত থেকে আসা বন্যার পানি

- মরিচ্চাপ ও বেতনা নদীর নাব্যতা হ্রাস।
- ব্যাংদহা স্লুইসগেটের ভিতরে ও বাইরে পলি জমা।
- খেজুরডাঙ্গী ও রাজনগর স্লুইসগেট দিয়ে বর্ষা মৌসুমের অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং উজানের পানি নিষ্কাশন হতে না পারা।
- মৃতপ্রায় সোনাই নদী ও শার্শা নদীর কোন সংযোগ নদী বা শাখা খাল না থাকা।
- বিলের পানি নিষ্কাশনের খাল অবৈধ দখল করে বাঁধ বা পাটা দিয়ে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করা, ইজারা গ্রহিতা কর্তৃক বুজামারার খালটি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা।

সম্ভাব্য সমাধান

- মরিচ্চাপ ও বেতনা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা।
- পলিবাদের উপর দিয়ে খাল কেটে হাজিখালীর বিলের সঙ্গে যুক্ত করা।
- ঝাউডাঙ্গা বাজারের পশ্চিম পাশের পানি নিষ্কাশনের গেট ও ব্যাংদহা স্লুইসগেট সংস্কার করা।
- বুড়ামারা খালের লীজ বন্ধ করা,বিলের মধ্যের খালগুলির বাঁধ, পাটা অপসারণ ও অবৈধ দখল মুক্ত করা, সোনাই নদীর সমস্ত সংযোগ খাল, মুকুন্দপুর মাঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত খাল পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও পানি নিষ্কাশন উপযোগী করা।
- ভারতীয় বন্যার পানি প্রতিরোধের জন্য সীমান্ত বাঁধ সংস্কার করা।

৮। তালা উপজেলা

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি বিজড়িত কপোতাক্ষ নদের তীরে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা অবস্থিত (চিত্র-২০)। এ উপজেলার উত্তরে কলারোয়া ও কেশবপুর, উত্তর-পূর্বে ডুমুরিয়া, পূর্ব-দক্ষিণে আশাশুনি ও পশ্চিমে সাতক্ষীরা সদর উপজেলা অবস্থিত। লাল বেলে দোঁআশ মাটিতে গঠিত এ উপজেলার ভূমি খুব উর্বর। ধান, পাট, পেয়াজ, রসুন, আলু ও নানা প্রকার সবজি এখানে প্রচুর উৎপাদন হয়। বর্তমানে এখানে পেয়ারা, কাঠাল, আম, লিচু, জামরুল ইত্যাদি নানা ফল চাষেরও বিস্তার ঘটেছে। উপজেলার অধিকাংশ নীচু জমি জোয়ার ভাটায় প্লাবিত হয়,এ সকল নিচু জমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হয়। কপোতাক্ষ নদ ও বুড়িভদ্রা এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদী। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর।

কিছু পরিবারের লোকেরা নদীতে বাগদা পোনা ও মাছ ধরা, সুন্দরবন নির্ভর বিভিন্ন পেশায় জড়িত। মাটি ও পানিতে অধিক লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও খাবার পানির সংকট এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

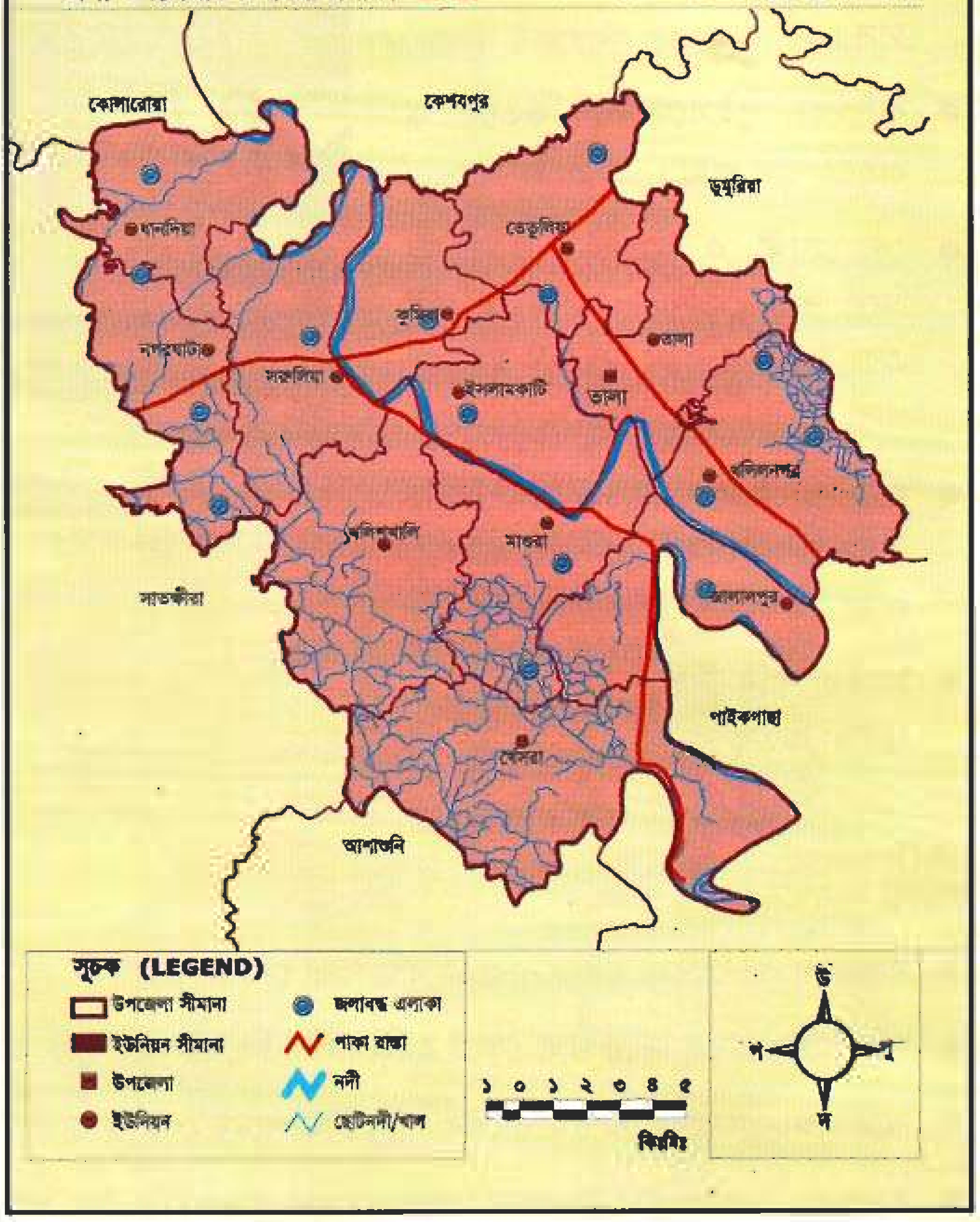

তালা উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা চিত্র : ২০ জেলাঃ সাতক্ষীরা

জলাবদ্ধ এলাকা

- তেঁতুলিয়া ইউনিয়নের নওয়াপাড়ার বিল, দেওয়ানী পাড়া, ধলবাড়িয়া, বকশিয়ার বিল ও বিল মথুরা।
- ইসলামকাটি ইউনিয়নের কেশা, ইসলামকাটি, নাংলা, সুজনশাহা, বাওখোলা ও গনডাঙ্গা বিল।
- তালা ইউনিয়নের মুড়াকলিয়া, আলাদিপুর, দধিসারা ও জেয়ালা বিল।
- খলিলনগর ইউনিয়নের হাজরাকাটি, কাঠবুনিয়া, মহান্দি, নলতা, হরিশ্চন্দ্রকাটি, দাশকাটিসহ সকল বিলসমূহ এবং গঙ্গারামপুর, ঘোষ নগর ও গোনালী গ্রাম।
- মাগুরা ইউনিয়নের মাগুরা, জেঠুয়া, দলুয়া, মাদরা, বালিয়াদহ, গড়ের আবাদ, বাইনতলা, দেবতলা ও খোব্বাবিল।
- খেসরা ইউনিয়নের শালিখা জলমহল, বাঁশতলা, বারুইখালি, রাজাপুর, হরিহরনগর, বাদুড়িয়া, সোলাবাদাম, বাউড়ি বয়ারশিং পাথরঘাটা জলমহল ।
- নগরঘাটা, ধানদিয়া, সরুলিয়া ও কুমিরা ইউনিয়নের সকল গ্রাম।

জলাবদ্ধতার কারণ

- ভদ্রা নদীর তলদেশ, কপোতাক্ষ, বুড়ীভদ্রা,শালিখা ও শালতানদী পলি জমে ভরাট হওয়া।
- গোপালপুর, নরনিয়ার, বাদুড়িয়া, ইসলামকাটি ও শালিখা নদীর স্লুইসগেটের সামনে ও পিছনে পলি জমা ।
- বিলের সঙ্গে সংযোগ খালসমূহ বাঁধ দিয়ে মাছের ঘের তৈরী করা।
- ঘোনার বিডি ও বিসি খাল পলি পড়ে উঁচু হওয়া ।
- অধিকাংশ সরকারী খাল ইজারা দেয়া।

সম্ভাব্য সমাধান

- কপোতাক্ষ নদী প্রয়োজনীয় পুনখনন করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা ও তা রক্ষার জন্য নদীর দু'ধারের বাওড় ও বড় বড় বিলে টি,আর,এম বাস্তবায়ন করা ।
- শালতা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করার জন্য টি আর এম ব্যবস্থা চালু করা।
- ভরাট হওয়া স্লুইসগেটসমূহের সামনে ও পিছনে খনন করে পানি নিষ্কাশনের উপযোগী করা।
- সকল খালের অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা ।
- সুভাষিনীর বিল থেকে গোপালপুর গেট পর্যন্ত, মাগুরা খেয়াঘাট থেকে গলভাঙ্গা গেট পর্যন্ত, হাড়িয়াদহ হতে কালিবাড়ি পর্যন্ত ও নওয়াপাড়া বিসি খাল, গড়ের আবাদ খাল, মথুরা হতে বগা গেট পর্যন্ত খাল ও জেলেখালী খাল পুনখনন করা।
- টিআরএম এর মাধ্যমে পলি ভরাট করে নীচু বিল উঁচু করা।

৯। আশাশুনি উপজেলা

সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা আশাশুনি (চিত্র-২১)। সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত এ উপজেলার উত্তরে সাতক্ষীরা, দেবহাটা, তালা, পশ্চিমে কালিগঞ্জ, দক্ষিণে শ্যামনগর ও পূর্বে খুলনা জেলার কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলা অবস্থিত। কপোতাক্ষ, খোলপেটুয়া, মরিচ্চাপ, বেতনা, কলকেতলা, বাঁশদহা সহ বেশ কিছু ছোটবড় নদী এ উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। কিছু পরিবারের লোকেরা নদীতে বাগদা পোনা ধরা, মাছ ধরা, সুন্দরবন নির্ভর বিভিন্ন পেশায় জড়িত। এ উপজেলার অধিকাংশ ভূমি দিনে ২ বার জোয়ার ভাটায় প্লাবিত হয়। ধান এ উপজেলার প্রধান ফসল। বর্তমানে এখানে বাগদা চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। মাটি ও পানিতে অতিরিক্ত লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদী ভরাট, জলাবদ্ধতা ও খাবার পানির সংকট এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

আশাশুনি উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা চিত্র : ২১ জেলাঃ সাতক্ষীরা

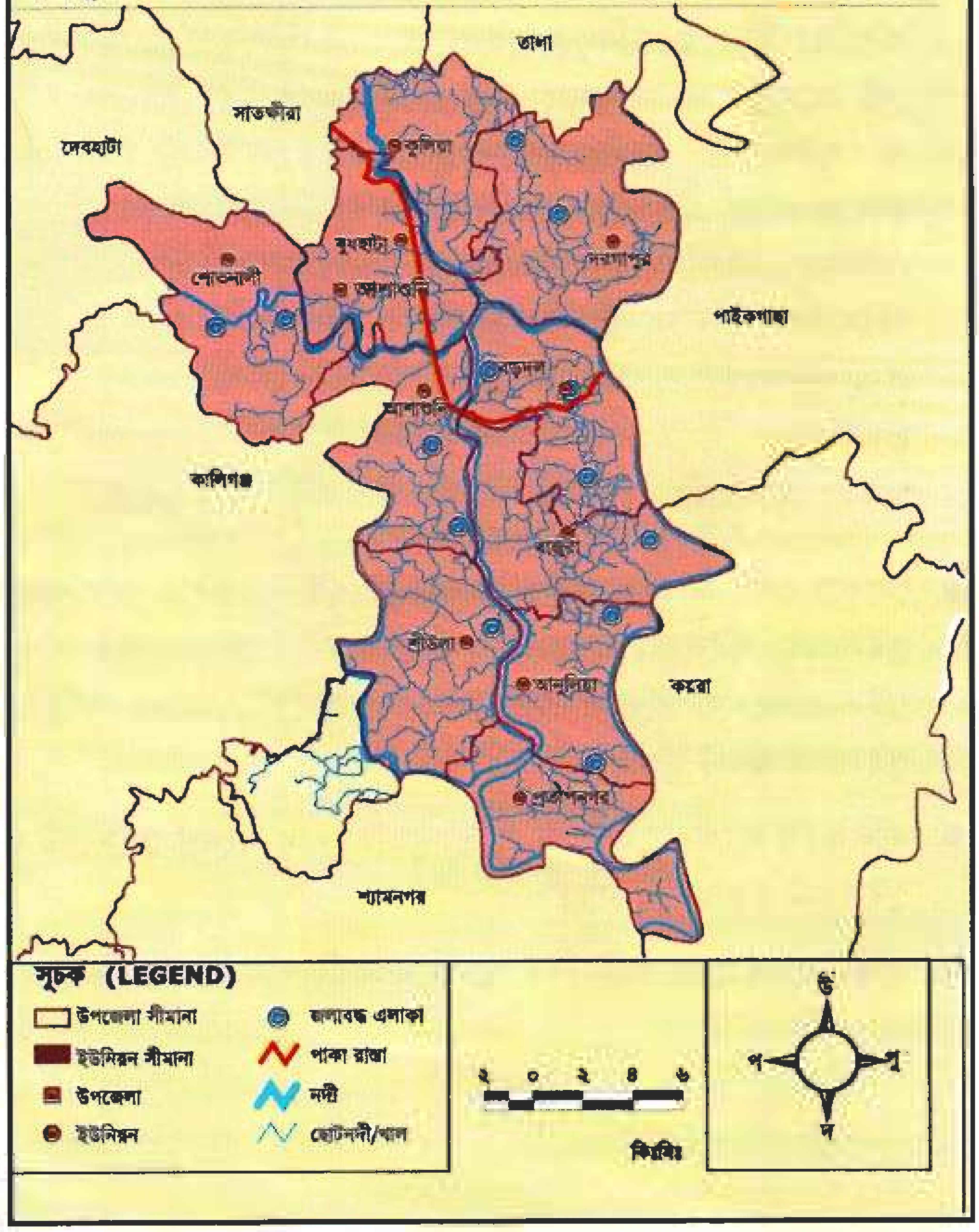

জলাবদ্ধ এলাকা

- আনুলিয়া ইউনিয়নের তারালি, ধশিটিয়া, নয়াখালি ও ভোলানাথপুর ।
- দরগাপুর ইউনিয়নের কুল্যা, কাদাকাটি কলকেতলা, খরিয়াটি, শ্রীরামপুর, বিলকিমারা, মুবিদখালী ও যাতমোড়ক মোকামখালি।
- খাজুরা ইউনিয়নের কালকী, হরিমালে, গদাইপুর।
- শোভনালী ইউনিয়নের বাসদোহা ও কামালকাটি।
- শ্রী উলা ইউনিয়নের উত্তর পুঁইজালা বালিঝাকি খাল অঞ্চল।
- বড়দল ও আশাশুনি ইউনিয়নের সকল গ্রাম।

জলাবদ্ধতার কারণ

জলাবদ্ধতায় ঘর-বাড়ির সঙ্গে নিমজ্জিত হয়েছে নলকূপ

- কলকেতলা নদী ও খরিয়াটি পূর্ব চর নদী ভরাট।
- গরুলি স্লুইসগেট সংলগ্ন খাল, ধশিটিয়া খাল ও মনিপুর স্লুইস গেট সংলগ্ন খাল, বাসদোহা নদী ও স্লুইসগেট সংলগ্ন খাল, কামালকাটি বিভূতি খাল, দেবশিয়া খাল,গদাইপুর খাল, হরিমঙ্গল খাল,কালকি খাল, প্রতাপনগর ইউনিয়নের কাটাখাল, গড়ইমহল খাল, চাকলা দোলখালী বয়াবিল খাল, পুঁইজালা সরুয়াখাল ভরাট।
- মোকামখালী, সাতমোড়ক ও গাবতলী গেট, দেবশিয়া খাল,গদাইপুর খাল,হরিমঙ্গল খাল,কালকি খাল সংশ্লিষ্ট স্লুইসগেট, পুঁইজালা সরুয়াখালের স্লুইসগেট, গোকুল নগর খাল সংলগ্ন স্লুইস গেট, আতুলকাঠির খাল সংলগ্ন স্লুইস গেট, খলিশখালি খাল সংলগ্ন স্লুইসগেট, করের বাড়ির কাছের স্লুইসগেট, বাজার বাড়ীর সন্নিকটের স্লুইসগেট ভরাট হওয়া।
- বালিঝাকি খালের স্লুইসগেট ও বামনডাঙ্গা খাল সংলগ্ন স্লুইসগেট অবৈধ দখল, বাঁধ দেয়া, তিতুখালী খাল সংলগ্ন স্লুইসগেট ইজারা দেওয়া।
- ভূমিহীনদের মধ্যে পানি নিস্কাশনের সরকারি খালসমূহ স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া।

সম্ভাব্য সমাধান

- কপোতাক্ষ ও গুতিয়াখালী নদীর ভরাট অংশ পুনখনন, মরিচ্চাপ ও গলঘেশিয়া সংযোগ নদী সংস্কার করা।
- মরিচাপ, খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষ নদীতে জেগে ওঠা চরসমূহ অপসারণ ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নদীর সাথে স্লুইসগেট দ্বারা সংযুক্ত খালসমূহ অবৈধ দখল মুক্ত করা।
- পানি নিষ্কাশনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারি বাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো অপসারণ করা।

১০। ডুমুরিয়া উপজেলা

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলা খুলনা,সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা (চিত্র-২২)। এ উপজেলার উত্তরে মনিরামপুর, অভয়নগর,ফুলতলা, উত্তর পূর্ব সীমান্তে খুলনা, পূর্বে বটিয়াঘাটা, দক্ষিণে পাইকগাছা এবং পশ্চিম দিকে তালা ও কেশবপুর উপজেলা অবস্থিত। বাংলাদেশের বৃহত্তম ডাকাতিয়া বিল এ উপজেলায় অবস্থিত যা দীর্ঘদিন যাবৎ জলাবদ্ধ। হামকুড়া ও ভদ্রা নামে এ উপজেলার দু'টো বড় স্রোতস্বিনী নদী ছিল, যে নদী দিয়ে একসময় কুমির চলাচল করতো। বর্তমানে পলি জমে এ নদী দু'টো সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয়ে গেছে। ভদ্রা, বুড়িভদ্রা, হরিহর, শোলমারি, শালতা ও ঘ্যাংরাইল নদী এ উপজেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ধান ও বিভিন্ন প্রকার সবজী এ উপজেলার প্রধান কৃষিজাত ফসল। জলাবদ্ধতার কারণে অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকায় বর্তমানে গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ হয়। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর তবে জলাবদ্ধতার কারণে কৃষি জমি ও কৃষিকাজ হারিয়ে কিছু কৃষক পরিবারের লোকেরা কৃষি পেশা পরিবর্তন করে বর্তমানে রিকশা ও ভ্যান চালায়। এছাড়া মাছ ও চিংড়ি চাষ এবং বেচাকেনা সংক্রান্ত পেশায়ও অনেকে জড়িত হয়েছে। জলাবদ্ধতা, নদীভরাট, খাবার পানিতে অধিক মাত্রায় লবণাক্ততা ও আর্সেনিকের উপস্থিতি এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

ডুমুরিয়া উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা ■ ■ চিত্র : ২২ ■ ■ জেলাঃ খুলনা

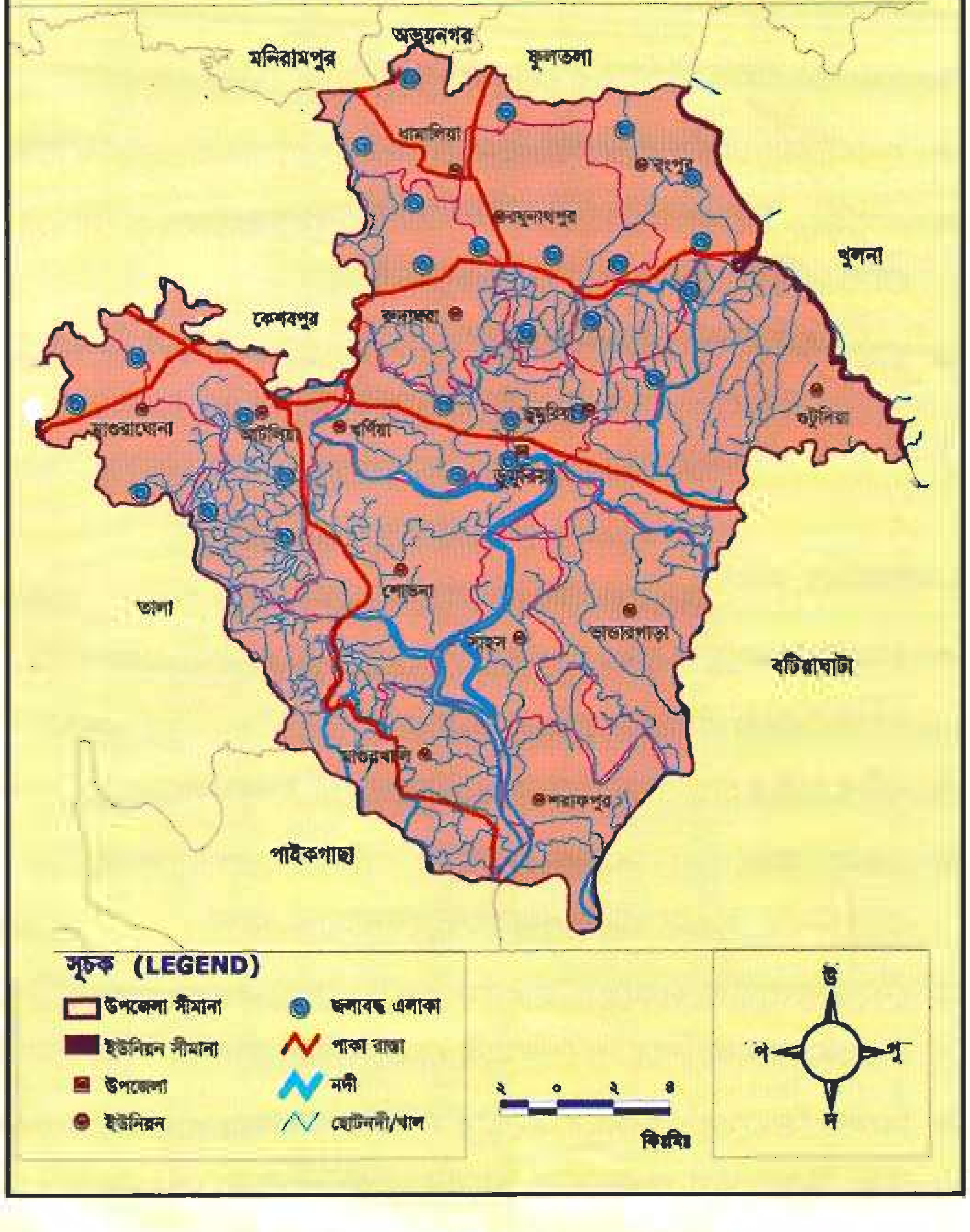

জলাবদ্ধ এলাকা

- বিল ডাকাতিয়া অঞ্চলের কোমরাইল, রূপরামপুর, টোলনা, রংপুর, কৃষ্ণনগর, গজেন্দ্রপুর, দেড়ুলী, ঘোনা মাদার ডাঙ্গা, থুকড়া, বিল শলুয়া ও সাহাপুর মৌজা।
- মধুগ্রাম বিল অঞ্চলের দহাখোলা, ধামালিয়া, চেচুড়ি, পাকুড়িয়া, কাঠেঙ্গা, রঘুনাথপুর, বরুনা, আন্দুলিয়া, ছবাড়িয়া ও মধুগ্রাম মৌজা।

মৃত হামকুড়া নদীর উপর বালিয়াখালী ব্রীজ, যার তলায় নির্মিত হয়েছে মুরগীর খামার ও গোয়ালঘর

- মাধবকাটি বিলের হাসানপুর, মিকশিমিল, মির্জাপুর, মাধবকাটি, রামকৃষ্ণ পুর, সাজিয়াড়া ও খড়িয়া মৌজা।
- ডুমুরিয়া বাজার এলাকার বাহাদুরপুর, হাজিডাঙ্গা, গোলনা, উখড়া, আরাজি সাজিয়াড়া, খলশী ও আরাজি ডুমুরিয়া মৌজা।
- গোনালী বারআনী বিলের গোনালী ও টিপনা মৌজা।
- কুলবাড়িয়া/চাকুন্দিয়া এলাকার কুল বাড়িয়া, মালতিয়া, চাকুন্দিয়া ও বয়ারসিংগা মৌজা এবং চণ্ডিপুর মৌজা।
- বাদুড়িয়া বিলের নর্নিয়া, বাদুড়িয়া রঘুনাথপুর, আটলিয়া, ঘোসড়া হিমামদ্দীনপুর, উত্তর বেতাগ্রাম ও কাঞ্চনপুর মৌজা।
- চাতরা বিলের মৈখালি, ঘোনা, ভাণ্ডারপাড়া, বান্দা, বড়বন্দো, কাঞ্চননগর, হাজীবুনিয়াও নলঘোনা মৌজা।
- ডুমুরিয়া, রাজিবপুর ও উলা মৌজা।

জলাবদ্ধতার কারণ

- হামকুড়া, ভদ্রা, হরিহর, হাজীবুনিয়া ও খিচিমিচি নদী পলি জমে ভরাট হওয়া, শৈলমারী, শালতা ও ঘ্যাংরাইল নদীর নাব্যতা হ্রাস।
- নদীর গভীরতার চেয়ে বিলের গভীরতা বেশী হওয়া ও বিলের পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকা।
- বরুনা ,দহাখোলা, কাঠেঙ্গা, খাড়িয়া, সঙ্গিখালেরগেট, কুলবাড়িয়া ও বাদুড়িয়া স্লুইসগেটের ভিতরে ও বাইরে পলি জমার কারণে পানি নিষ্কাশনের ক্ষমতা না থাকা।
- কেজেডিআরপি প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭/১ পোল্ডারভূক্ত মাধবকাটি বিলের পানি ১.৫ থেকে ২ ফুট উঁচু ২৭/২ পোল্ডারের মধ্য দিয়ে ও শৈলমারী রেগুলেটরের মাধ্যমে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।
- বিলের ভিতরের খালসমূহ সংস্কার না করা, নরনিয়া খাল ভরাট হওয়া, বিভিন্ন খাল অবৈধ দখল করে ঘের নির্মাণ করা, মুচের খাল ও মোরালে খালের বিভিন্নস্থানে অবৈধভাবে বাঁধ নির্মাণ করা।

- খাস খালসমূহ স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত প্রদান, জলকর ইজারা প্রদান ও ইজারা গ্রহিতা কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে বাঁধ ও পাটা দেওয়া।

সম্ভাব্য সমাধান

- হামকুড়া ও ভদ্রা নদী পুনখনন করে মধুগ্রাম, বিল ডাকাতিয়া, মাধবকাটি, খলশী ও উখড়া মোছাঘোনা বিলে জোয়ার ভাটা (টি আর এম) চালু করা।
- শৈলমারী নদী দিয়ে পার্শ্ববর্তী বিলে টিআরএম চালু করা।
- হরিনদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ভবদহের পাশদিয়ে সরাসরি কেটে বিল বকর, খুকশিয়া বা ক্যাদারিয়া বিলে টিআরএম নির্মাণ করা।
- ঘ্যাংরাইল, নলঘোনা ও হাজীবুনিয়া নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও রক্ষা করা।
- স্লুইসগেটসমূহ সংস্কার করা।
- বাদুড়িয়া গেট হতে মঙ্গলকোট ভায়া পাঁচপোতা রামকৃষ্ণপুর খাল ও তরু খাল পুনখনন করা।
- পানি নিস্কাশনের সরকারী খালসমূহের পাটা ও বাঁধ অপসারণ করা এবং ইজারা প্রদান না করে খালসমূহ সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা।

১১। পাইকগাছা উপজেলা

খুলনা জেলার পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলার সীমান্ত বরাবর পাইকগাছা উপজেলা অবস্থিত (চিত্র-২৩)। এ উপজেলার উত্তর পাশে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া, পূর্বে বটিয়াঘাটা, দাকোপ, দক্ষিণে কয়রা এবংপশ্চিম পাশে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও তালা উপজেলার অবস্থান। শিবসা, কপোতাক্ষ ও সালতা এ উপজেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত প্রধান নদী। এ উপজেলার অধিকাংশ জমি মূলত জোয়ার ভাটা প্লাবনভূমি যা দিনে ২ বার জোয়ার ভাটায় প্লাবিত হয়। ধান এ উপজেলার প্রধান কৃষিজাত ফসল।

পাইকগাছা উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা ■ ■ চিত্র : ২৩ ■ ■ জেলাঃ খুলনা

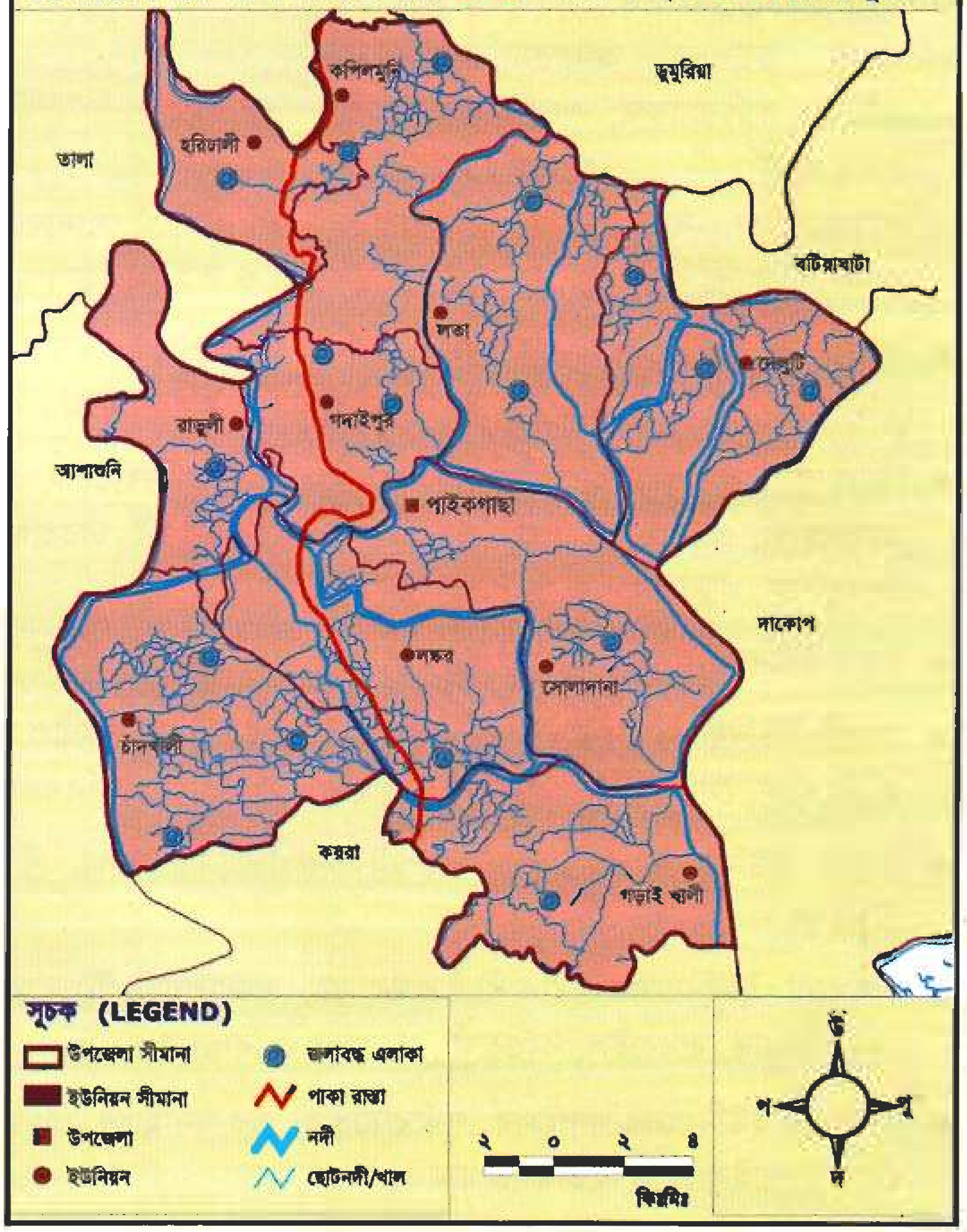

বর্তমানে এ প্লাবনভূমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হয়। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। কিছু পরিবারের লোকেরা নদীতে বাগদা পোনা ধরা, মাছ ধরা ও সুন্দরবন ও নদী নির্ভর বিভিন্ন পেশায় জড়িত। মাটি ও পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভরাট, জলাবদ্ধতা, ও খাবার পানিতে লবণাক্ততা, আয়রণ ও আর্সেনিকের উপস্থিতি জনিত খাবার পানি সংকট এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

জলাবদ্ধ এলাকা

পানি বন্দি অসহায় জীবন

- হরিঢালী ইউনিয়নের উত্তর সনাতনকাটী, হরিঢালী মাহমুদকাটী, নোয়াকাটী, উত্তর সলুয়া, শ্রীরামপুর ও গোয়ালবাথান
- কপিলমুনি ইউনিয়নের রামনগর কাশিমনগর, রেজাকপুর, নাসিরপুর গোয়ালবাথান, তালতলা, চিনামন হাউলী।
- লতা ইউনিয়নের লতা, পুতুলখালী ধলাই, কাশিচর, আধারমানিক হাড়িয়া, কাচিয়ারবন্দ, শংকরদানা, তেঁতুলতলা, পনারাবাদ, শামুকপোতা, বাহিরবুনিয়া, হালদারচক, কাটামারি, গোদারডাঙ্গা, পুটিমারি, হাসিরাবাদ, রেখামারি, বামনেরআবাদ, বুয়াচোপা, আছাননগর, মুনকিয়া ও বাইনচাপড়া।
- গড়াইখালী ইউনিয়নের গড়াইখালী, ফকিরাবাদ, শান্তা, উত্তর কুমখালী, দক্ষিণ কুমখালী, হোগলারচক, কানাখালী, আমিরপুর, বগুলারচক, পাতড়াবুনিয়া ও বাইনবাড়ীয়া।
- সোলাদানা ইউনিয়নের পাইকগাছা, পারসেমারী, খালিয়ারচক, ছালুবুনিয়া, নুনিয়াপাড়া, পশ্চিম কাইনমুখ, আমুরকাটা, সোলাদানা, শিশুতলা, টেংরামারী, বয়ারঝাপা, চারবান্ধা, ভেকটমারী, পাটকেলপোতা, পাটনিখালী, বেতবুনিয়া, খাটুয়ামারী ও সোনাখালী।
- লস্কর ইউনিয়নের লস্কর, কড়ুলিয়া, আলমতলা, লক্ষীখোলা, খড়িয়া।
- দেলুটি ইউনিয়নের গেওয়াবুনিয়া, চকমারী, মধুখালী, আলোকদ্বীপ, রাধানগর, জিরবুনিয়া, দেলুটী, দারণমলিক, হরিণখোলা, সৈয়দখালী, কালীনগর, বিগরদানা, হাটবাড়ী, তেলিখালী, সেনেরবেড়, নোয়াই, দুর্গাপুর ও মাগুরা।
- রাড়ুলী ইউনিয়নের বোয়ালিয়া, পশ্চিম চকড়াভড়িয়া, বাঁকা, শ্রীকণ্ঠপুর, ভবানিপুর, আরাজী ভবানিপুর ও শ্রীধরপুর।
- চাঁদখালী ইউনিয়নের মৌখালী, কমলাপুর, গজালিয়া, গড়েরআবাদ, ঢেমসাখালী, চাঁদমুখী, কাটাবুনিয়া, ফেদুয়ারাবাদ, ধামরাইল, কাওয়ালী, ফতেপুর ও বিষ্ণুপুর।
- গদাইপুর ইউনিয়নের গদাইপুর, পূর্ববোয়ালীয়া, চর গদাইপুর, চেঁচুয়া, মঠবাড়ি, গোপালপুর, ঘোষাল, ভাটামারী, মেলেকপুরাইকাটী ও হিতামপুর গ্রাম।

জলাবদ্ধতার কারণ

- সমগ্র উপজেলার নদীসমূহে পলি জমে নাব্যতা হ্রাস পাওয়া।
- হরিঢালী ইউনিয়নের নসিরাপুর খালে বাঁধ ও পাটা দেয়া।
- কপিলমুনি ও লতা ইউনিয়নের খালগুলি অবৈধ দখল করা, স্লুইসগেটসমূহ পলি দ্বারা ভরাট হওয়া।
- গড়াইখালী ইউনিয়নের খাসখাল ও মরা নদী মাছ চাষের নামে অবৈধ দখল।
- পানি নিষ্কাশনের পথ না রেখে অপরিকল্পিত ভাবে বিভিন্ন বিলে চিংড়ি ঘের নির্মাণ।

সম্ভাব্য সমাধান

- ভরাটহওয়া নদী পুনঃখনন, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও রক্ষা করা।
- সকল খাল ও জলাভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করে পানি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখা।
- স্লুইসগেট ও সংশ্লিষ্ট খালগুলি সংস্কার করা ও স্লুইসগেট সংলগ্ন জলমহল ইজারা না দেয়া।
- চিংড়ি ঘেরের ভেড়ীবাঁধ দ্বারা বন্ধ হওয়া সরকারী খাল ও নালাগুলো পানি নিষ্কাশনের জন্য উন্মুক্ত করা ও পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে পরিকল্পিতভাবে চিংড়ি ঘের নির্মাণ করা।

১২। রূপসা উপজেলা

খুলনা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের উপজেলা রূপসা (চিত্র-২৪)। এ উপজেলার উত্তরে খুলনা জেলার তেরখাদা, পূর্বে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট, মোল্লাহাট ও বাগেরহাট উপজেলা, পশ্চিম পাশে খুলনা, দৌলতপুর ও দীঘলিয়া উপজেলার অবস্থান। আঠারবাকি নদী এ উপজেলার প্রধান নদী। ধান, নারিকেল, পান, সুপারী,বাঁশ ইত্যাদি এ উপজেলার প্রধান কৃষিজাত ফসল। বর্তমানে জোয়ার ভাটার প্লাবনভূমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হয়। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভরাট, জলাবদ্ধতা ও খাবার পানির সংকট এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

রূপসা উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা ■ ■ চিত্র : ২৪ ■ ■ জেলাঃ খুলনা

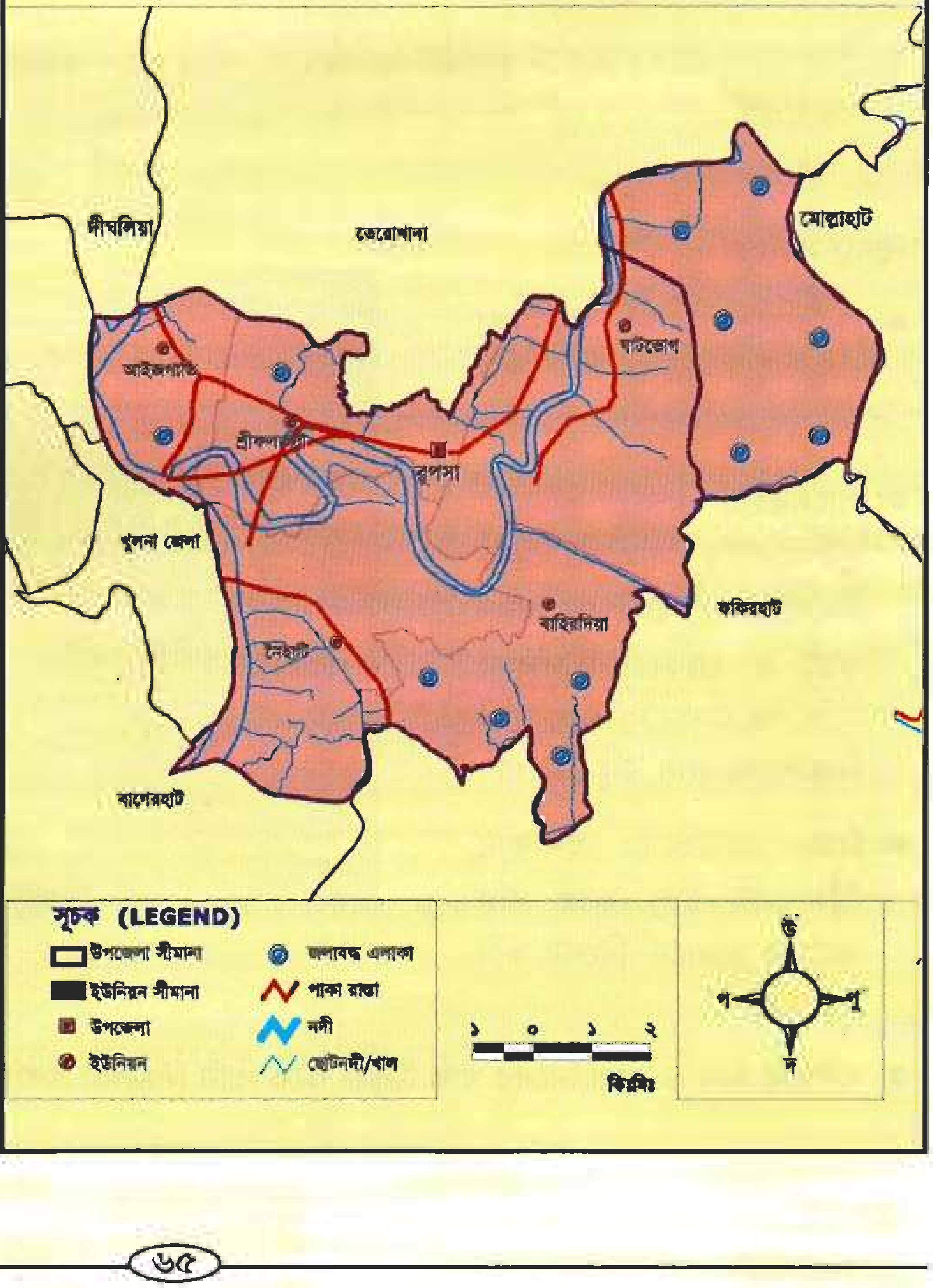

জলাবদ্ধ এলাকা

- ঘাটভোগ ইউনিয়নের শেখপুরা, খড়বটে, আনন্দ নগর, পুঁটিমারি, হোসেনপুর, আজগোড়া ও আমতলা গ্রাম বর্ষাকালে সম্পূর্ণ জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। চন্দনকাঠি, আলাইপুর ও ডুমরা গ্রাম আংশিকভাবে জলাবদ্ধ হয়। (পুটিমারি, ডোমরা, চন্দনশ্রী, আনন্দনগর শেখপাড়া, বিল মৌভোগ, দক্ষিণ বামনডাঙ্গা ও আজগড়া বিল)।
- টি এস বি ইউনিয়নের খাজাডাঙ্গা, পাথরঘাটা, তিলো, স্বল্প বাহিরদিয়া, পাঁচআনী ও নৈহাটি গ্রামের দক্ষিণাংশ।
- আইজগাতি ইউনিয়নের আইজগাতি উত্তরপাড়া, খানমোহাম্মদপুর, শিরগাতি ও রাজাপুর গ্রাম এলাকা।
- শ্রীফলতলা ইউনিয়নের মোসাব্বাতপুর, জোয়ার, শ্রীফলতলা ও বাদাল গ্রাম এলাকা।

জলাবদ্ধতার কারণ

- আঠারোবাকী নদীর নাব্যতা হ্রাস।
- পালের হাট খাল, পুঁটিমারি খাল ও স্লুইসগেট ভরাট।
- জলকর বন্দোবস্ত নিয়ে বাঁধ দিয়ে মাছচাষ করার কারণে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন পথ না থাকা।
- পাকা সড়কে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কালভার্ট না থাকা।
- শ্রীফলতলা গ্রামের নিকটে প্রবাহিত আঠারবাকি নদীর পাশে ওয়াপদা বাঁধ নির্মাণের ফলে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হওয়া।

সম্ভাব্য সমাধান

- আঠারবাকী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও পুনঃভরাট রোধ করা।
- পালেরহাট খাল, পুঁটিমারি স্লুইসগেটের সামনের ৪/৫ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন করা ও সরকারী খালসমূহ বন্দোবস্ত প্রদান না করে পানি নিষ্কাশনের জন্য উন্মুক্ত রাখা।
- বিল মৌভোগ এলাকায় টিআরএম চালু করে পলি ভরাটের মাধ্যমে বিলের জমি উঁচু করা।

জলাবদ্ধতায় ধ্বসেপড়া কাচা ঘরবাড়ী

- নদীয়ার খাল ও তারা বিলের খাল উন্মুক্ত করে পানি নিষ্কাশন উপযোগী করা।

১৩। তেরখাদা উপজেলা

খুলনা জেলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজেলা তেরখাদা (চিত্র-২৫)। এ উপজেলার উত্তরে যশোর জেলার কালিয়া উপজেলা, পূর্বে বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলা, দক্ষিণে খুলনা জেলার রূপসা এবং পশ্চিম পাশে দীঘলিয়া উপজেলা অবস্থিত। আঠারবাকি, ভৈরব, আতাই ও কাটাখালি নদী এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য নদী। ধান, নারিকেল, পান, সুপারী, বাঁশ ইত্যাদী এ উপজেলার প্রধান কৃষি ফসল। বর্তমানে এ উপজেলার নিম্নভূমিতে গলদা চিংড়ি চাষের প্রসার ঘটেছে। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভরাট, জলাবদ্ধতা, ও খাবার পানির সংকট এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

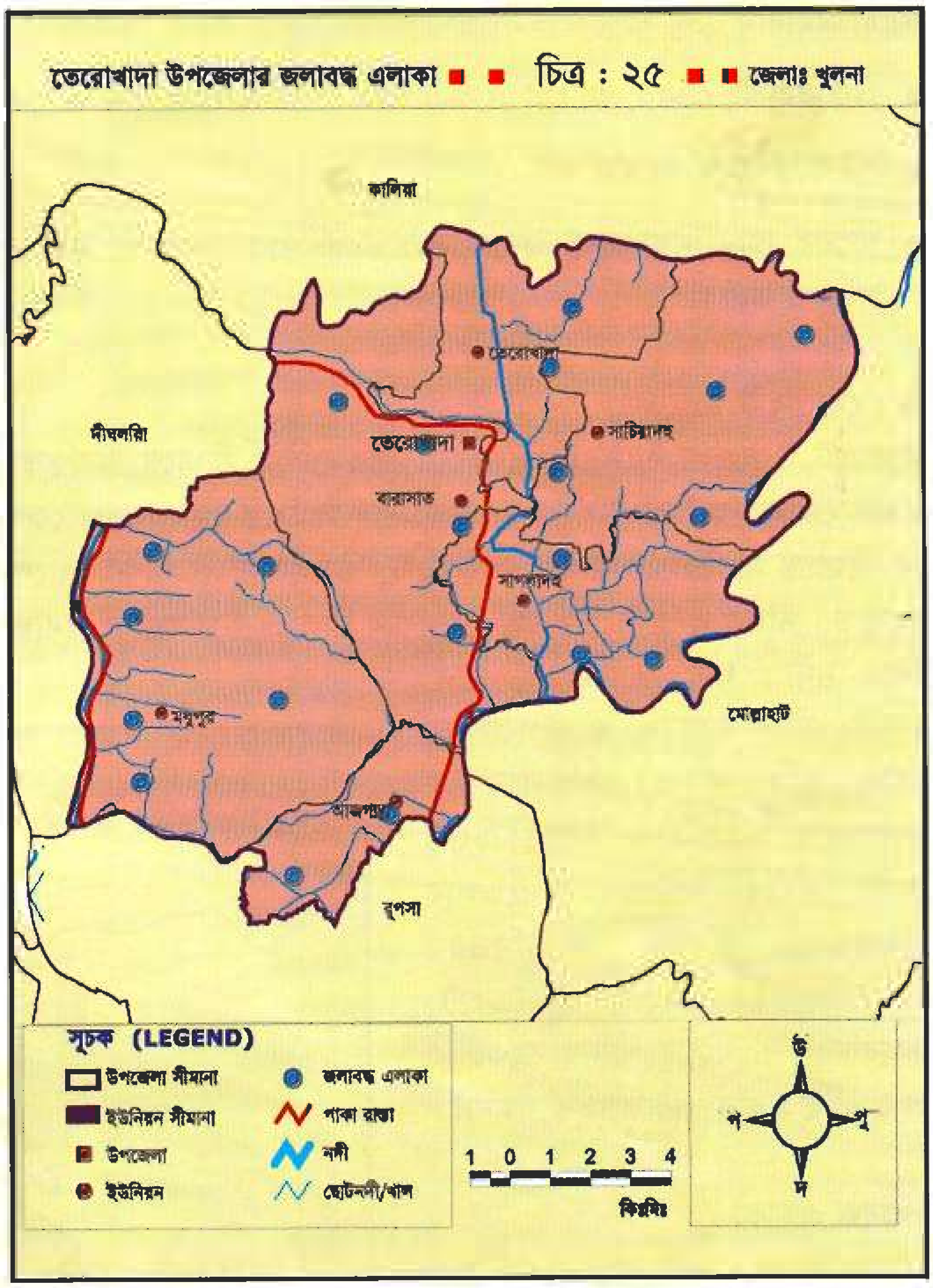

তেরোখাদা উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা চিত্র : ২৫ জেলাঃ খুলনা

জলাবদ্ধ এলাকা

মুলতঃ তেরখাদা উপজেলার সমগ্র বিলগুলি বর্তমানে 'বর্নাল সলিমপুর কোলাবাসুখালি বিল নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প' এর অর্ন্তভূক্ত। বহু পূর্ব হতে এই প্রকল্প এলাকা জলাবদ্ধ ছিল, লবণাক্ত পানি প্রবেশ ও বর্ষাকালীন বন্যায় প্লাবিত হতো। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ৮০ দশকের গোড়ার দিকে বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও আংশিক সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউ এস এ আই ডি-এর সহায়তায় ৯৫৩৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (১৯৭৮-৭৯ হতে ১৯৮২-৮৩) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হয়। প্রকল্পে নির্মিত রেগুলেটর ও নিষ্কাশন খালগুলি পলি ভরাট হওয়ায় বর্তমানে সমগ্র প্রকল্প এলাকায় কমবেশী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এই উপজেলার নীচু অঞ্চলে অবস্থিত গ্রামগুলি সারাবছর বা বর্ষাকালে জলাবদ্ধ থাকে।

জলাবদ্ধতার কারণ

- আঠারবাকি, ভৈরব, আতাই ও কাটাখালি নদীতে পলি ভরাট ও নাব্যতা হ্রাস।
- স্লুইসগেটসমূহ সংস্কার না করা।
- প্রয়োজনীয় সংস্কার না করায় বিলের ভিতরের খালসমূহের নাব্যতা হ্রাস পাওয়া ।

সম্ভাব্য সমাধান

- আঠারবাকী, ভৈরব, আতাই ও কাটাখালি নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও পুনঃভরাট রোধের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- স্লুইসগেটসমূহ সংস্কার করা ।
- বিলের পানি নিষ্কাশনের জন্য সকল ভরাট খাল পুনঃখনন করা এবং ভাঙ্গন কবলিত স্থানে বাঁধের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

১৪। মোল্লাহাট উপজেলা

মোল্লাহাট উপজেলা বাগেরহাট জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত (চিত্র -২৬) । এ উপজেলার উত্তর সীমানায় যশোর জেলার কালিয়া উপজেলা, উত্তর-পূর্ব সীমান্তে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট, চিতলমারি ও পশ্চিম পাশে খুলনা জেলার রূপসা ও তেরখাদা উপজেলা অবস্থিত। দীর্ঘকালব্যাপী জলাবদ্ধ কেন্দুয়ার বিল এ উপজেলায় অবস্থিত। আঠারবাকি ও চিত্রা নদী এ উপজেলার প্রধান নদী। ধান, নারিকেল, পান, সুপারী, বাঁশ ইত্যাদি এ উপজেলার প্রধান কৃষি ফসল। বর্তমানে এ উপজেলার নিম্নভূমিতে গলদা চিংড়ি চাষের প্রসার ঘটেছে। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভরাট, জলাবদ্ধতা, ও খাবার পানির সংকট এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

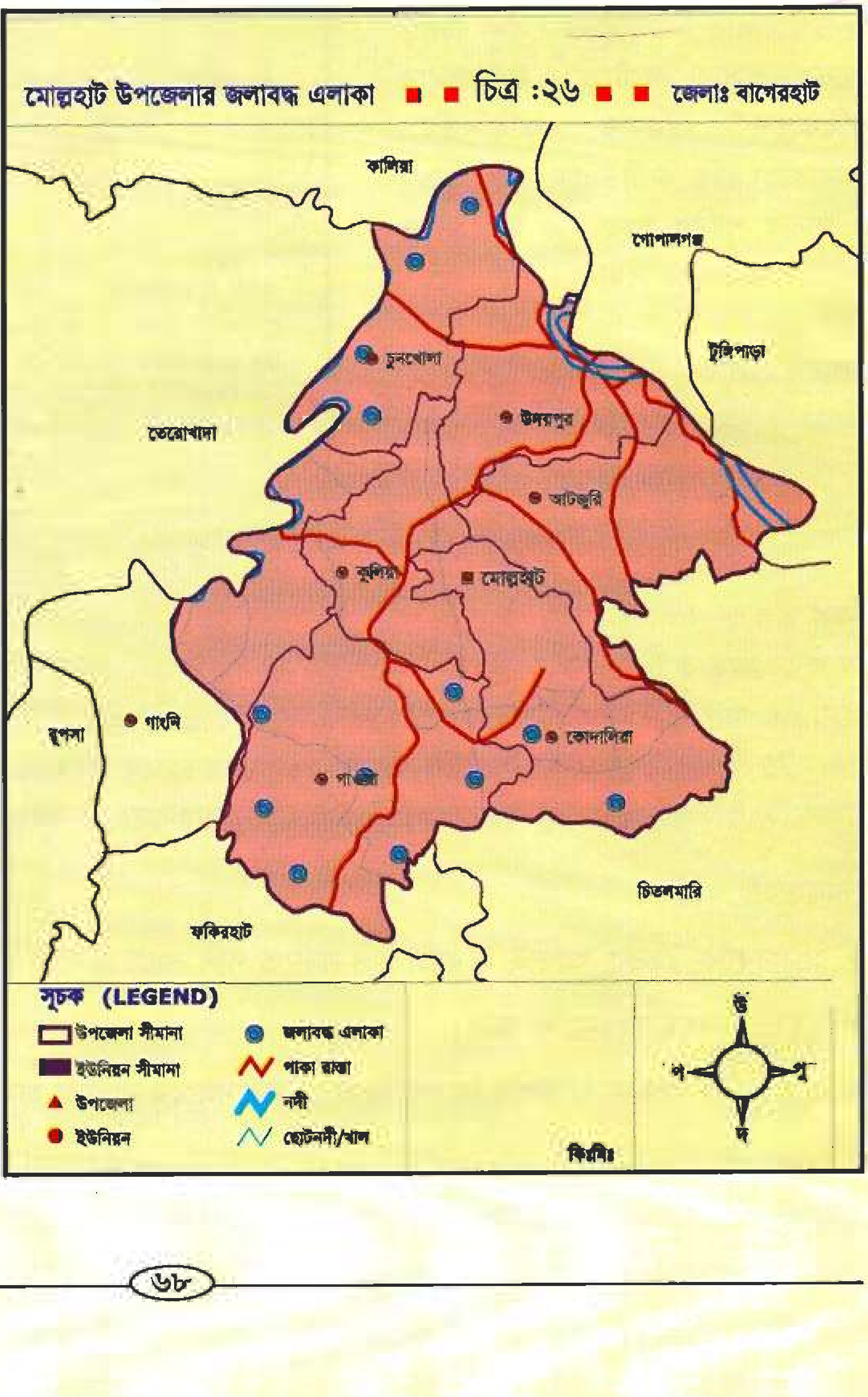

মোল্লহাট উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা ■ ■ চিত্র :২৬ ■ ■ জেলাঃ বাগেরহাট

জলাবদ্ধ এলাকা

- চুনখোলা ইউনিয়নের চুনখোলা, ছোটকাচনা ও শাসন মৌজা এবং ধবলিয়া বিল ও বিলসংশ্লিষ্ট গ্রামসমূহ।
- কোদালিয়া ইউনিয়নের কোদালিয়া বিল ও বিল সংশিষ্ট নিচু গ্রামসমূহ।
- গাওলা ইউনিয়নের কেন্দুয়ার বিল ও বিল সংশিষ্ট নিচু গ্রামসমূহ।

জলাবদ্ধতার কারণ

- আঠারবাকি ও চিত্রা নদীর নাব্যতা হ্রাস।

- নিষ্কাশন খালসমূহ (চুনখোলা, কাচনা ও শাসন খাল) ভরাট ও বিলের পানি নিষ্কাশন পথ না থাকা।

সম্ভাব্য সমাধান

- আঠারবাকী ও চিত্রা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও রক্ষা করা, এই দুই নদীর পাশে প্রয়োজনীয় স্থানে বাঁধ নির্মাণ করা।
- চুনখোলা, কাচনা ও শাসন খাল পুনখনন করে আঠারবাকী নদীতে সংযোগ করা।
- ধবলিয়া বিলের খাল পুনখনন করা।
- পলি ভরাটে নীচু বিল উঁচু করা।

১৫। ফকিরহাট উপজেলা

বাগেরহাট জেলার পশ্চিম সীমান্তে খুলনা জেলার গাঁ ঘেসে মোল্লাহাট উপজেলা অবস্থিত (চিত্র-২৭)। এ উপজেলার উত্তর-পশ্চিমে খুলনা জেলার রূপসা উপজেলা, উত্তর সীমান্তে বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলা, পূর্বে চিতলমারী, দক্ষিণ-পূর্বে রামপাল, বাগেরহাট ও পশ্চিম পাশে বটিয়াঘাটা উপজেলা অবস্থিত। ভৈরব ও চিত্রা নদী এ উপজেলার প্রধান নদী। ধান, নারিকেল, পান, সুপারী, বাঁশ ইত্যাদি এ উপজেলার প্রধান কৃষিজাত ফসল। বর্তমানে গলদা চিংড়ি চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। উপজেলার অধিকাংশ পরিবার কৃষিনির্ভর। লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভরাট, জলাবদ্ধতা, ও খাবার পানিতে অধিক লবণাক্ততা ও আর্সেনিকের উপস্থিতি এ উপজেলার প্রধান পরিবেশগত সমস্যা।

ফকিরহাট উপজেলার জলাবদ্ধ এলাকা ■ ■ চিত্র :২৭ ■ ■ জেলাঃ বাগেরহাট

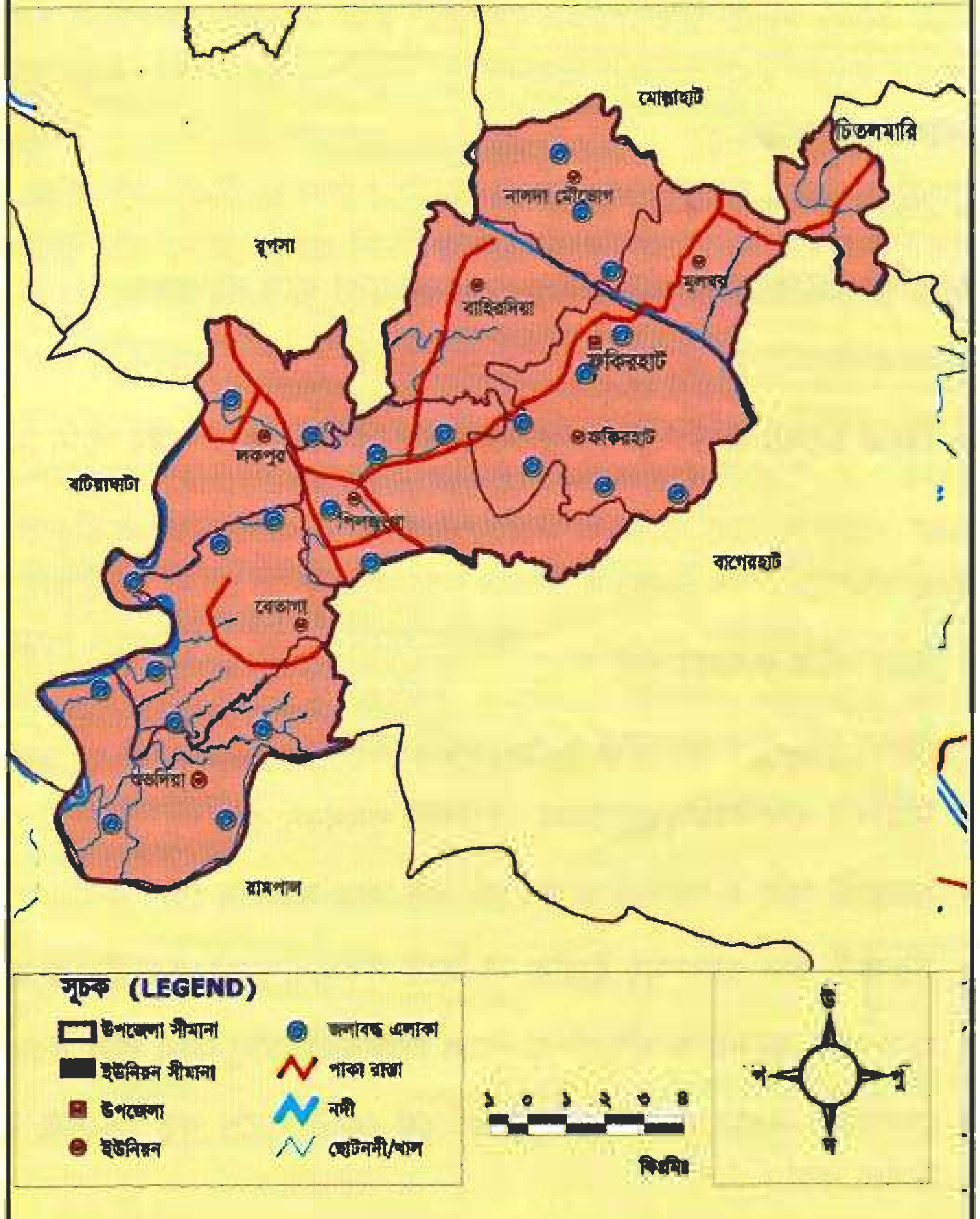

জলাবদ্ধ এলাকা

- বাহিরদিয়া ইউনিয়নের আটটাকা, সাতবাড়িয়া, বাহিরদিয়া, লালচন্দ্রপুর ও হোচলা মৌজা।
- বেতাগা ইউনিয়নের মাসকাটা, ধানপোতা, শিতলা ও বিঘাই মৌজা।

- ফকিরহাট ইউনিয়নের পাইকপাড়া, হোগলডাঙ্গা, ব্রাহ্মণরাখদিয়া, উত্তরপাড়া, পাগলাশ্যামনগর, সাতশিখা ও পাগলা দরগাপাড়া মৌজা।
- লকপুর ইউনিয়নের বলভপুর, লকপুর, খাজুরিয়া, ভাবনা ও খড়িবুনিয়া মৌজা।
- পিলজং ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গা, শাহাপুর, পিলজঙ্গা, বোয়ালতোলি, নোয়াপাড়া ও শ্যামবাঘাট মৌজা।
- শুভদিয়া ইউনিয়নের ঘনশ্যামপুর, তেরখাদা, শুভদিয়া, ছোট শুভদিয়া ও দিয়াপাড়া মৌজা।
- নলধা ইউনিয়নের মৌভোগ, কামটা, নলধা ও কাঁঠালি মৌজা।

জলাবদ্ধতার কারণ

- ভৈরব নদী ভরাটহওয়া।
- পলি অবক্ষেপনের ফলে চিত্রা নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া।
- প্রজোনীয় সংস্কারের অভাবে বিলের পানি নিষ্কাশনের খালসমূহ ভরাট হয়ে পানি নিষ্কাশনের অনুপযোগী হওয়া।
- চিংড়ি চাষের জন্য অপরিকল্পিতভাবে ঘের নির্মাণ করে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করা।

সম্ভাব্য সমাধান

- চিত্রা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা।
- ভৈরব নদী পুনখনন করে ও পুনঃভরাট রোধ করা।
- নিষ্কাশন খালসমূহ (আটটাকা, হোচলা) পুনখনন করা।
- সরকারী খাল ও পানি নিষ্কাশন পথ বন্ধ করে মাছচাষ রোধ করা।
- সরকারী খাস খালসমূহ ইজারা না দিয়ে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা।
- মাসকাটা ,ভাবনা ও খড়িবুনিয়া বিলে টিআরএম চালু করে পলি ভরাটের মাধ্যমে জমির উচ্চতা বৃদ্ধি করা।
- মোলাহাট নওয়াপাড়া মহাসড়কের যে কোন পাশে বড় ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় স্থানে কালভার্ট নির্মাণ করা।

১১. উপসংহার

উপকূল উন্নয়নের মূল সমস্যা দৃষ্টিভঙ্গীগত সমস্যা। এখানকার প্রতিবেশ ও পরিবেশকে যথাযথ বিবেচনায় না নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সমস্যা সামগ্রিকভাবে বিবেচনা না করে খণ্ডিতভাবে বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল প্রকল্প থেকে সাময়িকভাবে কিছু সুফল পাওয়া গেলেও পরিণতিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ বিপর্যের কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। এলাকায় বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা এর সত্যতা উপলব্দি করতে পারি।

জলাবদ্ধতাসহ অন্যান্য সমস্যা এ এলাকার মানুষের কাছে এখন বাঁচা-মরার প্রশ্ন। এ বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপনের সুযোগ নেই। অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে এ অঞ্চলের ভঙ্গুর অনন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশকে বিবেচনা করে সকল সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো এ অঞ্চলের জোয়ারের পানিতে প্রচুর পরিমানে পলিমাটির উপস্থিতি। উজান থেকে আসা ও জোয়ারবাহিত পলি সঞ্চিত হয়েই ধীরে ধীরে সমুদ্র উপকূলে এ অঞ্চলের ভূমি গঠিত হয়েছে। তাই এ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা বা নদী ভরাট সমস্যার সমাধান করতে হলে জোয়ার ভাটা ও পানি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে এই পলিমাটির বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। মেঘনা অববাহিকায় উজান থেকে আসা বাৎসরিক ২০০ কোটি টন পলির একটা বড় অংশ জোয়ারের পানিতে এ উপকূল অঞ্চলে উঠে আসে। অথচ উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে বিদেশী ও দেশী বিশেষজ্ঞগণ এ অঞ্চলের নদীর পানিতে নদীবাহিত এ বিপুল পরিমাণ পলিমাটির বিষয়টি বিবেচনায় আনেননি। তাই পোল্ডারে আবদ্ধ থাকায় এ অঞ্চলের বিলের জমিগুলি *পলিশূণ্য অবস্থায় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক নিচু রয়ে গেছে, ভূমির নিয়মিত নিম্নগমনের ফলে জমিগুলির উচ্চতাও* ক্রমান্বয়ে আরো কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে পোল্ডারের বাইরের অংশে বিশেষকরে নদীর প্রান্তসীমা, নদী বক্ষ ও নদীর চর ক্রমান্বয়ে পলিজমে উঁচু হয়ে চলেছে। এ কারণে বিলের পানি নিষ্কাশিত হতে না পেরে জলাবদ্ধতা এ অঞ্চলের স্থায়ী সমস্যায় রূপ নিয়েছে। আর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সামুদ্রিক জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ভবিষ্যতে এ অঞ্চল সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ধ্বংস হতে চলেছে এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য, প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। জনজীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্দশা। অথচ সঠিকভাবে জোয়ারের পানিতে ভেসে আসা পলিমাটিকে কাজে লাগাতে পারলে একদিকে যেমন নদী সমূহের নাব্যতা ধরে রাখা সম্ভব হত তেমনি সম্ভব হত জলাবদ্ধতা সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান করা। অন্যদিকে পরিকল্পিতভাবে পলি ভরাটের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এ অঞ্চলের সমুদ্রগর্ভে বিলীন হবার সম্ভাবনাকে স্থায়ীভাবে রোধ করা সম্ভব হত। তাই এ অঞ্চলের জোয়ার বাহিত পলির সঠিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে এখনই সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

১. Invironmental Management plan for the khulna Jessore drainage Rehabilitation project, Invironment and EGIS support project for water sector planing -1999.

২. Alam,M.K.Hasan,A.K.M.S.Khan,M,R.and Whitny J.W.1990:Geological map of Bangladesh,Geological survey of Bangladesh 1:1oo,oooo scale.

৩. Coleman.J.M.1969.Brahmaputra River, Channel processes and sedimentation : sedimentary Geology.v.3 p.129-239

৪. FAP 4,1993. Southwest Aria Water Resorces Management Project .peoples Repablic of Bangladesh Ministry of Irrigation,Water Development and Flood Control.

৫. Treaty between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India on sharing of the Gonga/Bangaes Water at Farakka-12th December, 1996.

৬. সুপেয় পানির সন্ধানে-উত্তরণ ও পানি কমিটি-২০০৪

৭. জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৭

৮. উপকূলীয় অঞ্চল নীতি-২০০৫

৯. জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-২০০২

১০. আজকের কাগজ, ১৩ ডিসেম্বর-২০০৩

১১. IPCC Report -2001.

১২. OGDA-2002.

উত্তরণ

actionaid
bangladesh

প্রধান অফিস : তালা, সাতক্ষীরা, ফোন : ০৪৭১-৬৪০০৬ এক্সটেনশন-২৮৩, মোবাইল : ০১৭১-১৮২৩৪৪
ঢাকা অফিস : উত্তরায়ণ (নীচতলা), ৪৬/২ জিগাতলা, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ০২-৮৬১৬১৮৪, ফ্যাক্স : ০৮৮-০২-৮১১৩০৯৫ (উত্তরণ)
ই-মেইল : uttran@bdonline.com

ডিজাইন : শেখর বিশ্বাস ; প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা : শেখ সেলিম আকতার স্বপন ; মুদ্রণ : প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা, ফোন-৮১০৯৫৭